

সহজ পাঠ

# জলবায়ু পরিবর্তন

দ্বিতীয় অংশ (৮ম-৯ম শ্রেণী)



সহজ পাঠ  
জলবায়ু পরিবর্তন  
দ্বিতীয় অংশ : অষ্টম ও নবম শ্রেণী



# সহজ পাঠ

## জলবায়ু পরিবর্তন

### দ্বিতীয় অংশ : অষ্টম ও নবম শ্রেণী

প্রক্ষিপ্ত প্রশ্নাঙ্ক

ডঃ সিরীগু কুমার দাশ  
ডঃ সুত্রক কুমার সাহা  
কুশল রায়

পর্যালোচনা ও সম্পাদনা

কাহান উদ্বিগ্ন আবেদন  
আরশাদ সিদ্দিকী  
তপন কুমার দাস  
এ কে এম মামুনুর রশিদ  
অলেক অধিকারী  
সালমা করমান  
শামীম আরফাজ

ব্যবহার পদ্ধতি

ইলিস আলী শেখান  
হেমেন খাতুন  
রিতা দাশ  
আসামুল হক

প্রকাশনা

আঞ্চলিক (AOSED)  
An Organization for Socio-Economic Development  
৩১, বসুপাড়া রোড  
খুলনা-৯১০০, বাংলাদেশ  
ফোন : ০৫১-৭২৪৩৯৭  
ই-মেইল : [aosed\\_khulna@yahoo.com](mailto:aosed_khulna@yahoo.com)

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০০৪

প্রকাশ পরিকল্পনা

শামীম আরফাজ  
শেখর বিশ্বাস

অন্তর্কল

শেখর বিশ্বাস  
মোঃ মাহমুজার রহমান  
সিরীগু বিশ্বাস  
শামীম আরফাজ

প্রক্রিয়া ও মুদ্রণ

অচাৰণী প্রিণ্টিং এস  
৪৪ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা  
ফোন : ০৫১-৮১০৫২৭

Implemented by AOSED  
In Partnership with CARE Bangladesh RVCC Project  
Financed by Canadian International Development Agency (CIDA)

যিনহাউস গ্যাস নির্মনের প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে জলবায়ু, বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন ত্রমবর্ধমান উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের কিছু অংশ সমুদ্রের লোনাপানিতে নিমজ্জিত হতে পারে। স্থানীয় পরিবেশ ও জনজীবনে নেমে আসতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

বাংলাদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সামান্য উচ্চ ভৌগোলিক অবস্থানের একটি ব-ধীপ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে আশংকা করা হচ্ছে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ১৫-১৭% ভূ-ভাগ সমুদ্রের লোনাপানিতে তলিয়ে যেতে পারে। উপকূলীয় বাঁধ থাকার কারণে এ বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নেমে আসতে পারে ভয়াবহ পরিবেশ দুর্ঘটনা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর খাপ-খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেয়ার বাংলাদেশ, কানাডিয়ান অন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (সিডি)’র অর্থায়নে Reducing Vulnerability to Climate Change (RVCC) একজন বাস্তবায়ন করছে, যা বাংলাদেশে এ ধরণের প্রথম উদ্যোগ। এ প্রকল্পের ১৬টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে এয়াওসেড (AOSED) ও ভার দিয়ে যাই (DDJ) দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাধ্যমিক কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এয়াওসেড (AOSED) নির্বাচিত কুলসমূহের ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণী ও ৮ম-৯ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক ২টি জলবায়ু বিষয়ক সহজ পাঠ্যপুস্তিকা, ফ্রিপ চার্ট ও শিক্ষক সহায়িকা প্রগ্রাম করছে।

নির্বাচিত কুল ও মাদ্রাসাসমূহে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতা বৃক্ষিমূলক ৮টি অধ্যায় পরিচালনার জন্য অফিস ও নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এ পুস্তিকাতি প্রণীত হচ্ছে।

আশা করা যাচ্ছে নির্বাচিত কুলসমূহের প্রায় ৭,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রকাশিত পুস্তিকার ৮টি অধ্যায় পার্শ্ব সম্পর্ক করার পর তারা জলবায়ু, জলবায়ুর প্রকারভেদ, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবর্তনের কারণ, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপখাওয়ানো বা অভিযোগ এবং পূর্বানুমান সাপেক্ষে ভবিষ্যৎ করানীয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করতে পারবে। একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত পাঠ উপস্থাপনার জন্য যে কৌশল বা পাঠ পক্ষতি অনুসরণ করা হবে সে পক্ষতির সাথেও ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় ঘটবে। যার মাধ্যমে এ পক্ষতির গ্রহণযোগ্যতা ও পুস্তিকার বিষয়বস্তুসমূহের প্রয়োজনীয়তা এবং মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

শামীম আব্দুল্লাহ

শামীম আব্দুল্লাহ  
নির্বাচিত পরিচালক  
এয়াওসেড (AOSED)

পুনিকাটি প্রগয়নে ডৃগমূল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমরা ধৰ্মী।

পুনিকা প্রগয়ন পরামর্শক দলকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করার জন্য কেবার আরভিসিসি প্রকল্পের টেকনিক্যাল এডভাইজার জন্ম আহসান উদ্দিন আহমেদ, এডভাভেক্সী কো-অডিনেটর এ কে এম মাঝেন্দুর রশিদসহ আরভিসিসি প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মীদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পর্যালোচনা ও সম্পাদনা পরিষদ সদস্য আহসান উদ্দিন আহমেদ, আরশাদ সিদ্দিকি, তপন কুমার দাস, সালমা রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পুনিকায় ভাষা, শব্দের বানান শব্দ ও পরিমার্জন করার জন্য অভিজ শিক্ষক বীরেন রায়, সুশান্ত কুমার সরকার, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাঙ্গন উপ-পরিচালক বাংলা একাডেমী ঢাকা, এহসান চৌধুরীর প্রতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বারাটি ক্লুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শুল পরিচালনা মন্ডলীর নেতৃবৃন্দকে, যারা মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণে (ফিল্ডটেট) আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন এবং তাদের মূল্যবান সহয় ও অভিযত্ত প্রদানের মাধ্যমে পুনিকাকে সমৃক্ষ করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের প্রাঙ্গন আঞ্চলিক পরিচালক আলিম উদ্দিনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাছি জিল্লার রশিদ চিপিও কেশবপুর, ঘোরা, আইরিন পারভীন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কালিয়া, নড়াইল, আঙুল হামিদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কালিয়া, নড়াইল-এর প্রতি। আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাছি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপ্লব রহমানকে।

নিলীপ দন্তের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট পুনিকা প্রগয়ন পরামর্শক দলের সকল সদস্যদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাছি ইন্ডিস আলী শোভন, হেলেনা খাতুন, রিতা দত্ত ও আসানুল হককে, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুনিকাটি প্রগয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে।

পুনিকায় ছবি অংকনের জন্য শেখের বিশ্বাস, মোঃ মাহফুজার রহমান, নিলীপ বিশ্বাস, প্রদূষৎ ভট্ট এবং অঞ্চল বিন্যাসে তুষার পাল, সৈয়দ শাহজাদ আলীকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গভীর মহসু দিয়ে যারা পুনিকাটির ছড়ান্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন সে মুদ্রণ কর্মীদেরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

## সূচিপত্র

অধ্যায়-১	:	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ পরিচিতি	০১
অধ্যায়-২	:	আবহাওয়া ও জলবায়ু	০৫
অধ্যায়-৩	:	বাংলাদেশের জলবায়ু	০৯
অধ্যায়-৪	:	জলবায়ু পরিবর্তন	১৫
অধ্যায়-৫	:	বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া	২৩
অধ্যায়-৬	:	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াসমূহ	২৭
অধ্যায়-৭	:	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য অভিযোগন বা খাপখাওয়ানো প্রক্রিয়া	৩১
অধ্যায়-৮	:	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধা	৩৯

এ সহজ পাঠ প্রগরনে আমাদের সাথে তিন সদস্যের পরামর্শক দল কাজ করেন। পরামর্শক দলের সদস্যরা হচ্ছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক জনাব নিলীপ কুমার দত্ত, সহকারী অধ্যাপক জনাব সুব্রত কুমার সাহা ও শেখ বর্ষের ছাত্র কুশল রায়।

পরামর্শক দলের নিরলস প্রচেটায় পুষ্টিকাটির একটি খসড়া প্রণীত হয়। খসড়া প্রগরনে পরামর্শক দলকে প্রথমেই ভাষার প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়। বাংলা ভাষায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সম-সাময়িক তথ্য-উপাত্ত হাতের কাছে না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে ইংরেজীতেই প্রগরন করা হয় প্রথম খসড়া।

কেয়ার আরভিসিসি কর্মকর্তাদের সাথে ইংরেজী খসড়াটি নিয়ে পর্যালোচনা-পরামর্শের পর ব্যাপক সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জনপূর্বক প্রথম বাংলা খসড়াটি প্রণীত হয়। বাংলা খসড়াটি পুনরায় কেয়ার-আরভিসিসির সাথে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনার পর পরামর্শক দল বাংলায় ছিতীয় খসড়া প্রণয়ন করেন।

ছিতীয় খসড়াটি নিয়ে খুলনায় একটি অংশগ্রহণযুক্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সাহিত্যিকরা পুষ্টিকাটির বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা ও অভিযন্ত অনুযায়ী পুষ্টিকাটির তৃতীয় খসড়া প্রণীত হয়।

তৃতীয় খসড়াটি পর্যালোচনা ও সম্পাদনার জন্য CAMPE (গণ স্বাক্ষরকা অভিযান)-এর তপন কুমার দাসকে প্রদান করা হয়। সংশোধন ও সম্পাদনা শেষে চতুর্থ খসড়াটি কেয়ার-আরভিসিসির এভতাইজার জনাব আহমেদ উদ্দিন আহমেদ ও এ্যাতোকেসি কো-অর্ডিনেটর জনাব এ কে এম মাঝুনুর রশিদের পরামর্শ অনুযায়ী পুষ্টিকার ভাষা আরো সহজ করার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক জনাব বীরেন রায় ও সুশান্ত কুমার সরকার সম্পাদনা করেন। এ পর্যায়ে পরামর্শক দল পঞ্চম খসড়াটির কাজ সম্পন্ন করেন।

পঞ্চম খসড়াটি মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষণের (ফিল্ড টেস্ট) জন্য প্রেরণ করা হয়। খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার দুটি, নড়াইলের কলিয়া উপজেলার একটি, যশোরের কেশবপুর উপজেলার একটি, সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার একটি, বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলার সাতটি মৌর্তি বারটি ক্ষুলের বাহ্যিক জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং বার জন্য শিক্ষকের অভিযন্ত ও প্রস্তা-বনাসমূহ যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা পূর্বক সংশোধন ও সংযোজন করা হয়।

পুষ্টিকায় ব্যবহৃত হিংগলো তৃতীয় পর্যায়ের খসড়ার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় এবং ধারাবাহিক প্রতিলিয়া ছবিগুলোও ব্যাপক সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক পুষ্টিকাটি ছাড়ান্ত করা হয়।

# অধ্যায়-১

## বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ পরিচিতি

এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ বিষয়ে জানতে পারবো :

- ক) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি গঠন,
- খ) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদী ও বনাঞ্চল।

### পাঠ ১.১: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি গঠন।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল যশোর, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট এবং পার্শ্ববর্তী জেলাঙ্গুলো নিয়ে গঠিত। এটি পদ্মাৱ (গঙ্গা নদীৰ বাংলাদেশ অংশেৰ নাম) ব-দ্বীপ অঞ্চল। ভূ-তাত্ত্বিকদেৱ মতে, এক সময়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-ভাগ সাগরেৰ নিচে নিমজ্জিত ছিল, যা গঙ্গাবাহিত পলল (সূক্ষ্ম বালুকণা, শিলাচূর্ণ, মাটি, বিভিন্ন জৈব পদার্থ) জমা হয়ে ধীৱে ধীৱে গড়ে উঠেছে।

এ অঞ্চলেৰ প্ৰস্থ বেশি হওয়াৱ কাৱণে মোহনাৰ কাছে নদীৰ গতিবেগ কমে যায়। এ অবস্থাৰ কাৱণে নদী পলি পৱিবহণেৰ ক্ষমতা অনেকাংশে হাৱিয়ে ফেলে এবং নদীবাহিত পলল মোহনায় সাগৱেৰ তলদেশে জমা হতে থাকে। এভাবে জমা হতে হতে পলল গঠিত এ ভূমি ধীৱে ধীৱে নদীৰ উপৰ জেগে ওঠে। আবাৰ সাগৱেৰ জোয়াৱে পলল প্ৰবাহ বাধা পেয়েও নদীৰ দু'পাশে অনেক দূৰ পৰ্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ধীৱে ধীৱে মোহনাৰ উজানে ভূমি জেগে ওঠে। নতুন নতুন ভূমি জেগে ওঠাৰ ফলে নদীৰ প্ৰবাহ বাধা পেয়ে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সব শাখা নদী আবাৰ একই পক্ষতিতে পলি সঞ্চয় কৱে নতুন নতুন ভূ-খণ্ড সৃষ্টি কৰে। এভাবেই গড়ে উঠেছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেৰ ভূ-ভাগ।

এছাড়াও বিভিন্ন সময় পলি পড়ে নদী গতিপথ পরিবর্তন করায় এ অঞ্চলে ছোট-বড় অসংখ্য জলাভূমি দেখা যায়। পলি দ্বারা গঠিত বলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে নিম্ন পললভূমি বলা হয়।

বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীতে উজানের পানি প্রবাহ করে যাওয়ায় পলল প্রবাহ কিছুটা হলেও করে গেছে। তাছাড়া উপকূলীয় বাঁধের কারণে গত প্রায় তিনি দশকের বেশি সময় ধরে জোয়ারের প্রবাহিত পলল সমতল ভূমির পরিবর্তে নদী বক্ষেই পতিত হচ্ছে। ফলে নদীগুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এ দুটি কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। পলল প্রবাহ অবরুদ্ধ হওয়ায় এ অঞ্চলের ভূমি-গঠন প্রক্রিয়া এখন অনেকটাই স্থির। যেহেতু এই অঞ্চলের স্বাভাবিক ভূমি গঠন প্রক্রিয়ায় এখন আর নদীবাহিত পলল তেমন কোন ভূমিকা রাখছে না, সেজন্য এ ভূমিকে এখন আর সক্রিয় ব-দ্বীপ বলা যায় না। আবার এ অঞ্চলে ভূমি গঠন প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ থেমে যায়নি। তাই এ অঞ্চলকে অপরিণত ব-দ্বীপ অঞ্চলও বলা যেতে পারে। সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলটি সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের মাত্র তিনি মিটার গড় উচ্চতায় অবস্থিত।

### পাঠ ১.২: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদী ও বনাঞ্চল।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল নদী বাহিত পলল দিয়ে গঠিত একটি “ব-দ্বীপ” অঞ্চল। এ অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী। যা শুধু ভূমি গঠন প্রক্রিয়ায় নয়, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এ এলাকার ক্ষীণ ব্যবস্থায় নদ-নদীর ভূমিকাই প্রধান। বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীসমূহ মৎস্য সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী পদ্মাৰ তিনটি প্রধান শাখা নদী প্রবাহিত হয়েছে। শাখা নদীগুলি হচ্ছে বৈরব, মাথাভাঙ্গা, গড়াই বা মধুমতি। তাছাড়া এই নদীগুলোর অসংখ্য শাখা নদী সমগ্র অঞ্চলে



জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য এ সব শাখা নদীর অধিকাংশই এখন নাব্যতা হারিয়ে মৃতপ্রায়। ভৈরবের প্রধান শাখা নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে ইছামতি, হাড়িয়াভাঙা, রায়মঙ্গল, কপোতাক্ষ, খোলপটুয়া প্রভৃতি। মাথাভাঙার প্রধান প্রধান শাখা হচ্ছে চূর্ণি, চিরা, নবগঙ্গা, কুমার ইত্যাদি। গড়াই-মধুমতির প্রধান শাখাগুলো হচ্ছে কালিগঙ্গা, কাজীবাছা, পশুর, আত্রাই, বলেষ্ঠর, হরিণটানা প্রভৃতি। এ অঞ্চলের অন্যান্য বড় নদীগুলোর মধ্যে শিবসা, আড়পাঙ্গশিয়া, আড়য়াশিবসা, বলেষ্ঠর, ভোলা, ভাঙ্ডা, চালকী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।



বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এবং খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে পৃথিবীখ্যাত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল 'সুন্দরবন' অবস্থিত, যার বর্তমান আয়তন প্রায় ৫,৭৭,০০০ হেক্টর। এছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও সুন্দরবনের কিছু অংশ বিদ্যমান। সুন্দরবনের পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙা, রায়মঙ্গল ও কালিন্দি নদী সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী ও খাল যা সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রেখেছে। সুন্দরবন বাংলাদেশের এক মূল্যবান সম্পদ ও গৌরব। ইতোমধ্যে ১৯৯৭ সালে ৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা 'ইউনেস্কো' সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই বাংলাদেশের সুন্দরবন আজ সমগ্র মানবজাতির সম্পদ ও গৌরবে পরিণত হয়েছে।

পৃষ্ঠাবীর অন্যান্য ম্যানচোভ বনাঞ্চলের তুলনায় সুন্দরবনে জীববৈচিত্র্য অনেক বেশি। সুন্দরবনের উদ্ধিদ জগৎ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানে প্রায় ৬৫ প্রজাতির উদ্ধিদ রয়েছে। যার মধ্যে সুন্দরী, পঙ্কু, গেওয়া, গরান, কেওড়া, ধুন্দল, বাইন, কাঁকড়া, সিংড়া, বলা, হেতাল, গোলপাতা, খলসি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মায়াবী চিরল হরিণ, বানর, বন্য শূকর, কুমির, মেছোবাঘসহ ৪৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫১ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৯ প্রজাতির উভচর প্রাণী সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া সুন্দরবনে প্রায় ২২৬ প্রজাতির পাথির সঞ্চান পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের ভূ-ভাগ দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতিদিন দু'বেলা জোয়ার-ভাটা এ বনভূমিকে প্লাবিত করে। সুন্দরবনের মাটি লবণাক্ত, দো-আঁশলা ও পলিযুক্ত, কোথাও কোথাও বেলে, আবার কোথাও কোথাও নরম কাদাযুক্ত। এই বনাঞ্চলের মাটি জৈব (হিউমাস) ও অজৈব উপাদান সমৃদ্ধ, উর্বর এবং কালচে-বাদামি বর্ণের। সুন্দরবনে বছরের গড় তাপমাত্রা  $24^{\circ}$  সে.-এর বেশি এবং বৃষ্টিপাত্রে পরিমাণ বছরে প্রায় ১৬০০ মিলিমিটার। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত দুটোই ঋতুভিত্তিক। শীত ঋতুতে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা কম হয় এবং বর্ষায় ৬০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।

#### পাদটীকা :

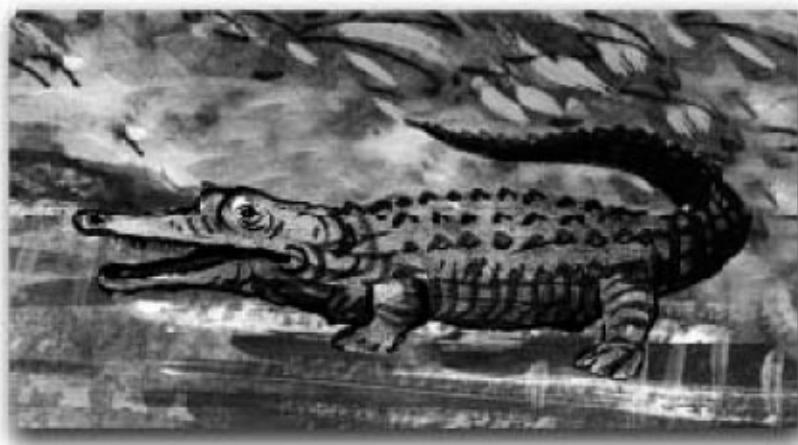
পলল = নদীবাহিত ভাসমান পদাৰ্থসমূহ।

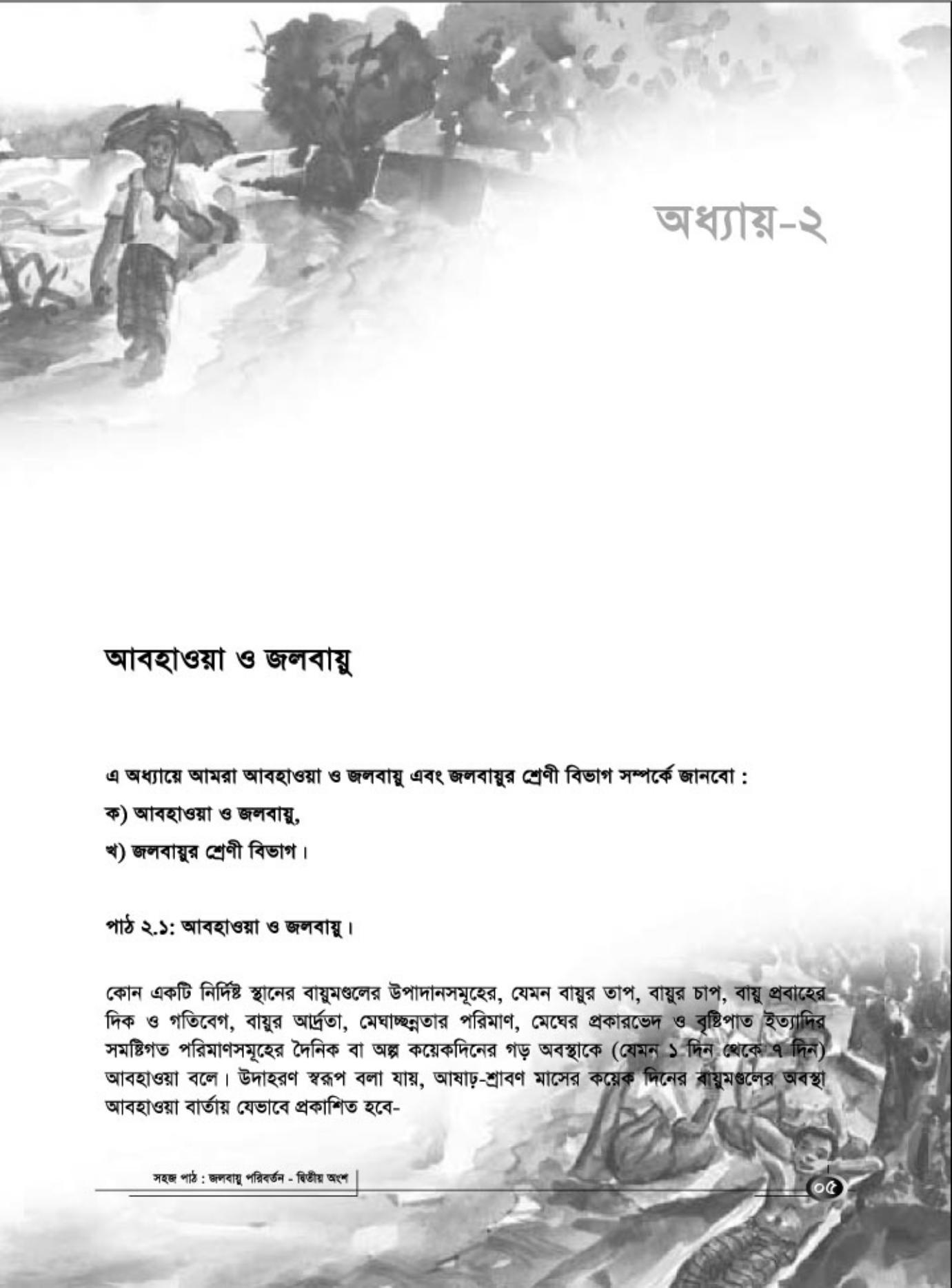
উপকূলীয় এলাকা = কূলের নিকটবর্তী এলাকা।

ব-ঝীপ = নিম্ন প্রবাহে নদী উর্ক্কগতি হতে পরিবাহিত পলি, বালি, কাদা প্রভৃতি মোহনার মুখে তরে তরে সঞ্চিত করে নতুন ভূখন্ড গঠন করে, একে ব-ঝীপ বলে।

সক্রিয় ব-ঝীপ = যেখানে ভূমি গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

পরিপৰ্বতা = যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।





## অধ্যায়-২

### আবহাওয়া ও জলবায়ু

এ অধ্যায়ে আমরা আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে জানবো :

- ক) আবহাওয়া ও জলবায়ু,
- খ) জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ।

#### পাঠ ২.১: আবহাওয়া ও জলবায়ু।

কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহের, যেমন বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহের দিক ও গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতার পরিমাণ, মেঘের প্রকারভেদ ও বৃষ্টিপাত ইত্যদির সমষ্টিগত পরিমাণসমূহের দৈনিক বা অল্প কয়েকদিনের গড় অবস্থাকে (যেমন ১ দিন থেকে ৭ দিন) আবহাওয়া বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের কয়েক দিনের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা আবহাওয়া বার্তায় যেভাবে প্রকাশিত হবে-

দিন	আবহাওয়া
শনিবার	তাপমাত্রা $32-33^{\circ}$ সে., বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা কম, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ $90$ শতাংশ। (এরকম একটা দিনে খুব গরম লাগবে ও ঘাম হবে প্রচুর)
রবিবার	তাপমাত্রা $30-32^{\circ}$ সে. থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হবে, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ $95$ শতাংশ। (এরকম হলে ঘাম কম হবে, গরম কম অনুভূত হবে)
সোমবার	তাপমাত্রা $25-30^{\circ}$ সে., অরোর ধারায় বৃষ্টি হবে, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ $95$ শতাংশ। (এরকম দিনে ঘাম হবে না)

দিনগুলোর এ রুকম অবস্থার সাথে আমাদের পরিচয় আছে। এই যে, একেকদিন একেক তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে বলে আবহাওয়া। শীতকালে, যেমন পৌষ বা মাঘ মাসে, দিনের অবস্থা হবে একরকম। অপরদিকে গ্রীষ্মে, যেমন বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে, হবে অন্যরকম। তাই একেক ঝর্তুতে আবহাওয়া একেক ধরনের হয়। পৃথিবীর আঙ্গিক গতি ও বার্ষিক গতির প্রভাবের জন্যে ঝর্তুচক্রের সৃষ্টি হয়।

কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের ( $30$  বছর বা বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর যে সাধারণ অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে।

তাই আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য স্থানের ও কালের। এককথায় স্বল্প স্থানে, স্বল্পকালীন বায়ুমণ্ডলের অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। বৃহৎ স্থানের দীর্ঘকালব্যাপী বায়ুমণ্ডলের সমষ্টিগত অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

## পাঠ ২.২ : জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন ধরনের উপাদানের দৈনিক ও বার্ষিক পরিবর্তনের প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু আলাদা হয়। পৃথিবীর যে অংশে মোটামুটি একই ধরনের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেই সব জলবায়ুকে এক একটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

জলবায়ুকে বিভিন্ন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যেমন-

ক. পর্যবেক্ষণভিত্তিক বা উচ্চিদের সংগে সম্পর্কযুক্ত শ্রেণী বিভাগসমূহ (তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে)।

খ. জলীয় পদার্থের পরিমাণভিত্তিক শ্রেণী বিভাগসমূহ (বৃষ্টিপাত, বাঞ্ছীয়ভবন ও প্রস্বেদন এবং বাতাসে পানির পরিমাণ)।

গ. উৎপন্নিগত বা বায়ুসংগ্রহলভিত্তিক শ্রেণী বিভাগসমূহ (বায়ুর চাপ ও বায়ু প্রবাহ, চাপবলয় এবং ঝর্ণার সম্পর্কভিত্তিক)।

উল্লিখিত জলবায়ুর শ্রেণীকরণে পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন অঞ্চলের অবস্থানকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অথচ দেখা যায় যে, শুধু অবস্থানের প্রকৃতিভেদে জলবায়ুর ভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিম্নে অবস্থানভেদে জলবায়ুকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হলো :

১. অক্ষাংশের অবস্থান বা নিরক্ষরেখা থেকে দূরত্বভিত্তিক অবস্থান।
২. মহাদেশীয় বা মহাসাগরীয় অবস্থান।
৩. উপকূলীয় অবস্থান। একে আবার প্রতিবাত অবস্থান ও অনুবাত অবস্থানে ভাগ করা যায়।
৪. বিভিন্ন উচ্চতাভিত্তিক অবস্থান।

এই অবস্থানগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পৃথিবীর জলবায়ুকে প্রধান পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

#### ১. নিম্ন অক্ষাংশের জলবায়ুসমূহ :

এ শ্রেণীকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—নিরক্ষীয় জলবায়ু, ক্রান্তীয় মহাদেশীয় বা ক্রান্তীয় আর্দ্র ও শুক্র (সাভানা) জলবায়ু এবং ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু।

নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রধান অঞ্চলসমূহ হলো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান অববাহিকা, আফ্রিকার জায়ারে অববাহিকা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঁজ এবং ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চল। সারাবছর ধরে একই রকম উচ্চ তাপমাত্রা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত এ জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ক্রান্তীয় মহাদেশীয় বা ক্রান্তীয় আর্দ্র ও শুক্র জলবায়ু অঞ্চল নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। আমাজান অববাহিকার পূর্বদিক, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া ও গায়ানা, ইকুয়েডরের উপকূল অঞ্চল, মধ্য আমেরিকার পশ্চিম দিকে কিউবার উত্তর দিকে, ব্রাজিল, বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে ইত্যাদি এই জলবায়ু-প্রধান অঞ্চল। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে এবং চীন ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু অংশসহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এই জলবায়ু বিদ্যমান। নিরক্ষীয় জলবায়ুর তুলনায় এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম এবং আর্দ্র ও শুক্র ঝর্ণা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর ব্যাপক প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ায় (ভারত উপমহাদেশে) দেখা যায়। অন্যান্য প্রধান অঞ্চলগুলি হলো মায়ানমার, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন।

#### ২. শুক্র জলবায়ুসমূহ :

শুক্র জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের চেয়ে বাষ্পীভবন-প্রস্তেন অনেক বেশি হয়ে থাকে। প্রধানত পৃথিবীর মরুঅঞ্চল এই শ্রেণীভূক্ত। এসব অঞ্চলে উচ্চিদ খুব কম জন্মে। আলজেরিয়া, লিবিয়া ও আরব মরুভূমির বিস্তৃত অঞ্চলে কোন উচ্চিদ জন্মায় না।

### ৩. উপক্রান্তীয় জলবায়ুসমূহ :

এ জলবায়ু শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে উচ্চদের ক্রমবৃদ্ধিতে গ্রীষ্মে উভাপের চেয়ে শীতকালে নিম্ন তাপমাত্রার বেশি প্রভাব দেখা যায়। চীনের পূর্বাঞ্চল, আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চল, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল, তিব্বতের মালভূমি, আন্দিজ ও রাকি পর্বতের কিছু অংশ এই জলবায়ু গোত্রের অন্তর্গত।

### ৪. মধ্য অক্ষাংশের জলবায়ুসমূহ :

উচ্চর গোলার্ধে এই জলবায়ু বিদ্যমান। দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ অঞ্চলে স্থলভাগ নেই। ফলে ঐ গোলার্ধে এই জলবায়ু দেখা যায় না। পশ্চিম ইউরোপ, এশিয়া, ইউরোপ ও উচ্চর আমেরিকার মধ্য অক্ষাংশীয় অঞ্চলে এ শ্রেণীর জলবায়ু বিদ্যমান। এসব অঞ্চলে প্রধানত দীর্ঘ তৃণভূমির আবরণ থাকে।

### ৫. উচ্চ অক্ষাংশীয় ও মেরুদেশীয় জলবায়ুসমূহ :

এ শ্রেণীর জলবায়ুসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অতিরিক্ত শীত, অতিদীর্ঘ শীতকাল এবং অতিসংক্ষিপ্ত ও উষ্ণ শীতকাল। এশিয়া ও উচ্চর আমেরিকার মেরু অঞ্চল, সাইবেরিয়া, কানাডার উত্তরাংশ, শ্রীগঙ্গায়ের উপকূলবর্তী অঞ্চল, অ্যান্টার্কটিকা ইত্যাদি অঞ্চল এই জলবায়ু শ্রেণীতে অবস্থিত।

উপরে অতিসংক্ষেপে পাঁচটি জলবায়ু শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, এই পাঁচ ভাগে মোট পনেরটি জলবায়ু শ্রেণী রয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীতে বিশেষ প্রাকৃতিক ও স্কুদ্র জলবায়ু সমৃদ্ধ অঞ্চলও রয়েছে।

#### পাদটীকা :

আহিক গতি = পৃথিবীর ২৪ ঘন্টার বা প্রতিদিনের আবর্তন।

বার্ষিক গতি = পৃথিবীর ৩৬৫ দিন বা ১ বছরের আবর্তন।

বাল্পীভবন = পানি বাল্পে পরিণত হওয়া।

প্রবেদন = পাতার মাধ্যমে গাছ বায়ুতে যে বাল্প নির্গত করে।

অক্ষাংশ = নিরক্ষরেখা থেকে উচ্চরে বা দক্ষিণে অবস্থিত কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ বলে।

## অধ্যায়-৩

### বাংলাদেশের জলবায়ু

এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পর্কে জানতে পারবো :

- ক) বাংলাদেশের জলবায়ুর সাধারণ বর্ণনা,
- খ) বাংলাদেশের বৃত্তচক্র।

#### পাঠ ৩.১ : বাংলাদেশের জলবায়ুর সাধারণ বর্ণনা ।

বাংলাদেশের অবস্থান হলো গ্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে পৃথিবীর অন্যান্য মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশে মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কিছু পাহাড়ি অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা নিচু সমতল ভূমি। বাংলাদেশকে ধীরে রয়েছে পূর্বে আরকান-ইয়ামা পর্বত শ্রেণী, উত্তরে সিলং মালভূমি এবং তারও উত্তরে সুউচ হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি এবং তারও পশ্চিমে বিস্তীর্ণ গঙ্গেয় সমভূমি। এরকম একটা অবস্থানের জন্য বাংলাদেশের মৌসুমী বায়ুর ভিন্নতা লক্ষণীয়।



দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে খুতু পরিবর্তনের সাথে সাথে তাপমাত্রার যে পার্থক্য হয় এবং তার ফলে বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের যে পরিবর্তন ঘটে, বাংলাদেশের জলবায়ুতে তারই প্রভাব দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে ভারত মহাসাগরে সৃষ্টি মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। গ্রীষ্মের শেষে একই পথে বিপরীত দ্রোতে মৌসুমী বায়ু আবার বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে যায় মহাসাগরে। তাই বাংলাদেশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব খুব প্রভল।

## পাঠ ৩.২ : বাংলাদেশের ঝুঁতুচক্র ।

বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তন, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বার্ষিক বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থাকে চারটি প্রধান ঝুঁতুতে ভাগ করা যায় । এগুলো হলো, শুক্র শীতকাল, প্রাক-মৌসুমী উষ্ণ গ্রীষ্মকাল, গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বর্ষাকাল এবং শরৎকাল । বাংলাদেশে হেমিস্ফারের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের সাথে শরৎকালের সঙ্গতি বেশি থাকায় এখানে একে শরৎকাল হিসাবে গণ্য করা হয় । নিম্নে ঝুঁতুগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো :

### ক. শুক্র শীতকাল :

শুক্র শীতকাল পৌষ, মাঘ ও ফালুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত । শীতকালে সাইবেরীয় অতিশীতল বায়ু উপমহাদেশের উভরে হিমালয় পর্বতমালার কারণে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে না । তবে মধ্য ইউরেশিয়ার শীতল বায়ু ভারতের উত্তরাঞ্চল হয়ে কিছুটা বাংলাদেশে প্রবেশ করে । এটি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ থেকে প্রবাহিত দক্ষিণ-পূর্বমুখী শীতকালীন মৌসুমী বায়ু, যা বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে । এই দীর্ঘ পথ্যাত্মায় বায়ুর শীতলতা অনেকখানি হ্রাস পায় ।



### মাঘ মাস সবচাইতে শীতল এবং

এই সময় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে গড় তাপমাত্রা  $10^{\circ}$  সে. -এর কাছাকাছি থাকে । এখান থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে তাপমাত্রা ক্রমে বাঢ়তে থাকে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে তা প্রায়  $20^{\circ}$  সে.-এর কাছাকাছি হয় । এই সময়ের বায়ু প্রবাহ স্তুল থেকে সমুদ্রগামী হওয়ায় বাতাসে আর্দ্ধতা থাকে অতি অল্প এবং আকাশ থাকে মেঘমুক্ত । এ সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাংলাদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের দুই শতাংশের বেশি নয় । বাংলাদেশের রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় এই শুক্র শীতল ঝুঁতুর স্থায়িত্ব চার মাসের বেশি । অর্থ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে, যেমন সিলেট, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে, এই ঝুঁতুর স্থায়িত্ব এক মাসেরও কম ।

### খ. প্রাক-মৌসুমী উষ্ণ গ্রীষ্মকাল

ফালুনের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রাক-মৌসুমী উষ্ণ গ্রীষ্মকাল বিস্তৃত । এই সময়ে

স্তুলভাগ থেকে শীতকালীন সমুদ্রমুখী বায়ু প্রবাহ এবং গ্রীষ্মকালে সমুদ্র থেকে স্তুলমুখী বায়ু প্রবাহের ফলে অন্তর্ভুক্তিকালীন ঝাতু শুরু হয়। এই সময়ে বাংলাদেশে বায়ুপ্রবাহের দিক ও গতিবেগ সুনির্দিষ্ট থাকে না। তবে সময়ের সাথে সাথে সমুদ্র থেকে স্তুলমুখী বায়ু প্রবাহে নির্দিষ্টতা আসতে থাকে, এবং বায়ুর গতিবেগও বাড়তে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রা হলো প্রাক-মৌসুমী উষ্ণ গ্রীষ্মকালের একটি বৈশিষ্ট্য।

**শুধু বাংলাদেশের উভর-পূর্বগঙ্গের**  
 কিছু এলাকা ছাড়া বাকি অঞ্চলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে সবচাইতে বেশি গরম অনুভূত হয়। এই সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা  $27^{\circ}-29^{\circ}$  সে. থাকে। এই ঝাতুর প্রথম থেকেই আকাশে মেঘাচ্ছন্নতার পরিমাণ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা ক্রমে (এই ঝাতুর শেষের দিকে) ৫০ থেকে ৬০ শতাংশে উন্নীত হয়। অতি উভাপের জন্যে উষ্ণ ও অর্দ্ধ বায়ু অতি প্লাবনশীল হয়ে ঝড়ে মেঘের সৃষ্টি করে এবং বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে শিলাপাত ও বজ্রপাতসহ ঝড় হয়। সিলেটের উভর ও পূর্বগঙ্গে

কালবৈশাখীর জন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে এ ঝাতুর বৃষ্টিপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই জলবায়ু কৃষি ঝাতুকে প্রভাবিত করে। এ সময়ে বাংলাদেশের বোরো ধান পেকে যায় এবং আউশ ও পাট বোনা হয়। সিলেটের চা বাগানে এ বৃষ্টি নতুন জীবনের সংগ্রাম করে।



#### গ. গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বর্ষাকাল

গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বর্ষাকাল জ্যৈষ্ঠের শেষাংশ থেকে আশ্বিনের শেষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের বঙ্গোপসাগরীয় অংশটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে উভর ভারতের মৌসুমী নিম্নচাপ এলাকার দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে এই সময়ে ক্রমাগত ৭ থেকে ১০ দিন এবং সিলেট ও কর্কুবাজার অঞ্চলে কখনো কখনো একটানা দুই থেকে তিনি সপ্তাহ বৃষ্টি হতে পারে।

বঙ্গোপসাগর থেকে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশে প্রবেশ করার সাথে সাথে বায়ুতে জলীয় পদার্থের পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকে আশ্বিনের প্রথম পর্যন্ত বাংলাদেশের সব জায়গায় বায়ুর আপেক্ষিক অর্দ্ধতা  $80$  থেকে  $90$  শতাংশ থাকে। বায়ুতে এত বেশি পরিমাণে জলীয়

বাস্প পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। বছরের মোট বৃষ্টিপাতের ৮০-৮৫ শতাংশ এই সময়ে হয়ে থাকে। মৌসুমী বর্ষার আগে ও পরে বঙ্গোপসাগরে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর কোন কোনটি বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে গড় তাপমাত্রা দেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে  $29^{\circ}$  সে. এর বেশি এবং পূর্বাঞ্চলে  $27^{\circ}$  সে. এর কাছাকাছি থাকে।

#### ৪. শরৎকাল

কার্তিকের প্রথম থেকে অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত শরৎকাল বিস্তৃত। শরৎকাল বর্ষাকালীন সমুদ্র থেকে স্থলমুখী এবং শীতকালীন স্থল থেকে সমুদ্রমুখী বায়ু প্রবাহের মধ্যে পরিবর্তনশীল ঝর্তু। এ সময় তাপমাত্রা থাকে মৃদুভাবাপন্ন। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে দেশে গড় তাপমাত্রা  $23^{\circ}-25^{\circ}$  সে. থাকে। তবে বায়ুতে জলীয়পদার্থ কম থাকে বলে এ তাপমাত্রাকে বেশ আরামদায়ক বলে অনুভূত হয়। এ সময়ে আকাশে মেঘাছন্নতার পরিমাণ ২৫ শতাংশের কম থাকে এবং বায়ুর আর্দ্রতাও কমে যায়। শরৎকালে বছরের প্রায় ৫ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়।

বর্ণিত এ চার ঝর্তুচক্রের সাথে বাংলাদেশের কৃষি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মৌসুমী বর্ষাকাল দু'টি কৃষি ঝর্তুকে প্রভাবিত করে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর আগমনকালে আউশ ধান কাটা হয় এবং আমন রোপণ করা হয়। অপরদিকে এ ঝর্তুর শেষ দিকে আমন ধান পাকতে থাকে। এ সময়ে হিমালয়



থেকে নেমে আসা পানিতে প্রতিবছর হালকা বন্যা হয়ে থাকে। হালকা বন্যা একটি প্রাবন ভূমিতে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই দেখা হয়। বাংলাদেশের মানুষ হালকা বন্যায় বরং খুশীই হয়, কেননা তা মাটির জন্য পুষ্টিকর খনিজ পদার্থ এবং পলি বহন করে আনে। কিন্তু অতিবন্যায় জান-মালের যেমন ক্ষতি হয় তেমনি জমিতে পলি পড়ে জমিকে পুনর্জীবন দান করে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এরকম বন্যা বেশ স্বাভাবিক ঘটনা। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় ‘বর্ষা’। তবে উজানে কখনো কখনো অতি বৃষ্টিগাতে বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। একে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ‘চল’। চল মানুষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি করে। বাংলাদেশের চিরহরিৎ ও মিশ্র পত্রমোচি বনাঞ্চলের উন্নবেও বর্ষা খাতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

#### **পাদটীকা :**

চিরহরিৎ = যেসব গাছে সারা বছরই সবুজ পাতা থাকে।

পত্রমোচি = বছরে বিশেষ সময়ে যে সব গাছের পাতা ঝরে যায়।



## অধ্যায়-৪



### জলবায়ু পরিবর্তন

এ অধ্যায়ে আমরা জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রমাণ এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্টি কারণসমূহ অবগত হবো :

- ক) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণসমূহ,
- খ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণসমূহ,
- গ) জলবায়ু পরিবর্তনে মনুষ্যসৃষ্টি কারণসমূহ।

পাঠ ৪.১ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণসমূহ।

পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ত পরিবর্তনশীল। বিগত কয়েক দশকে জলবায়ুর পরিবর্তনের বিষয়টি বিজ্ঞানী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

অতীতে যে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রমাণ নানা উৎস থেকে পাওয়া যায়। প্রধানত হিমবাহ ও বরফের আচ্ছাদন, গলনের আস্তরণ, সমুদ্রতলের পরিবর্তন, জীবাশ্চ এবং উক্তি থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া ভূ-তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক তথ্য থেকেও অতীতের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণ সংগৃহ করা হয়।

বর্তমানে হিমবাহ অনুপস্থিত এ রকম কোন এলাকা হিমবাহবাহিত শিলারাশিতে গঠিত হলে সহজেই অনুমেয় হয় যে, অতীতে এই এলাকায় ভিন্ন জলবায়ু ছিল। ভূতাত্ত্বিক সময়ের নিরিখে এ রকম অনেক এলাকার সঙ্গান পাওয়া যায়। দীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক সময়ে যেসব পলল স্তর জমা হয়েছে, সেগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমেও এই এলাকার অতীত জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার পুরনো চিহ্ন থেকেও বোঝা যায় যে, হিমবাহের আবরণ অতীতে বেশি বা কম ছিল।

পৃথিবীর সকল প্রাণী ও উক্তিদ তাদের জীবনধারণের জন্য বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এসব প্রাণী বা উক্তিদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়।

#### পাঠ ৪.২ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণসমূহ।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণসমূহ দুটি গোত্রে ভাগ করা যেতে পারে। সেগুলো হলো:

##### ক. পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলের বহিঃস্তু কারণসমূহ :

- সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক অবস্থানগত পরিবর্তন
- সূর্যের শক্তি উৎপাদনে হাস-বৃক্ষি।

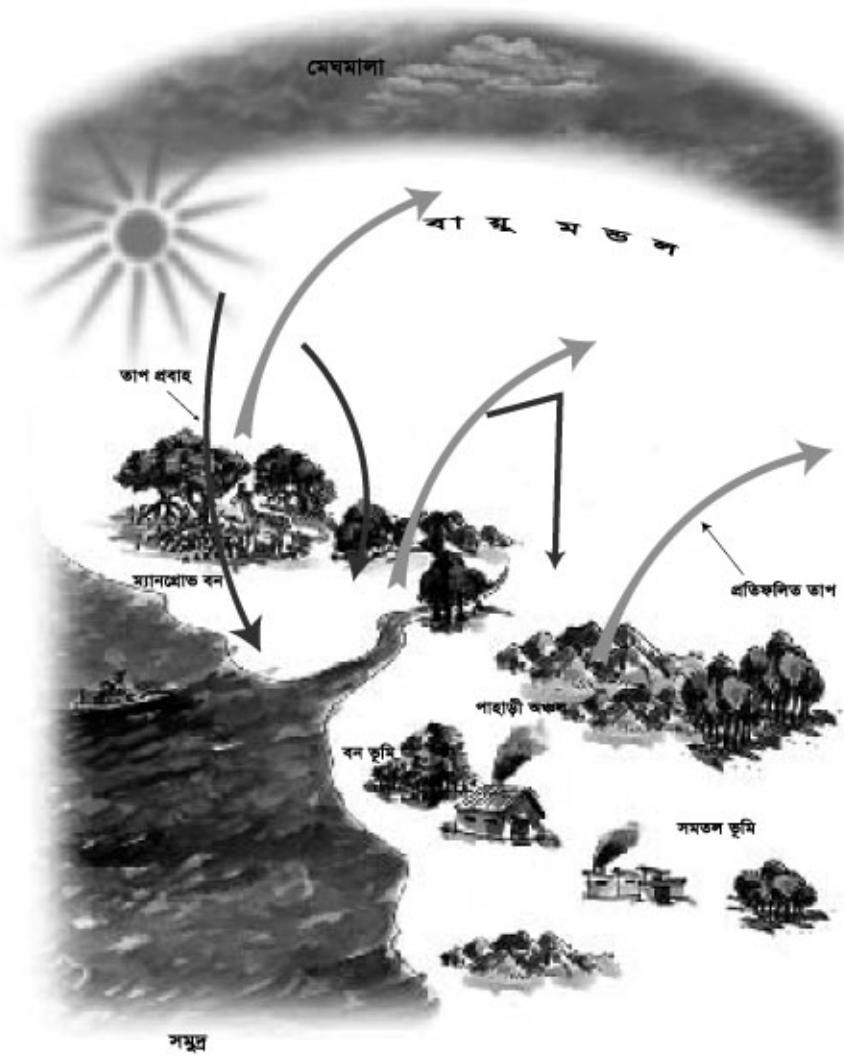
##### খ. পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ :

- বায়ুমণ্ডলের গঠন পরিবর্তন
- মহাদেশসমূহের স্থান পরিবর্তন
- মহাসাগরসমূহের সংক্ষিপ্ত তাপের পরিবর্তন।

পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন স্থানের সূর্যকিরণের এবং এই স্থানের জলবায়ুর প্রকৃতি প্রধানত নির্ভর করে পৃথিবীর অক্ষের কৌণিক অবস্থানের উপর, পৃথিবীর আহিক গতি ও বার্ষিক গতির উপর, পৃথিবীর কক্ষপথের আকৃতির উপর এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের উপর। এই নিয়ামকগুলো দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তনশীল, তাই পৃথিবীর জলবায়ুও পরিবর্তনশীল। তবে এই পরিবর্তনের গতি অত্যন্ত ধীর হয়ে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর অক্ষকোণ কোন লম্ব রেখার সাপেক্ষে  $23.5^{\circ}$  আছে যা প্রতি  $41,000$  বছরের ব্যবধানে  $22^{\circ}$  থেকে  $25^{\circ}$  পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে। যখন পৃথিবীর অক্ষের কৌণিক অবস্থান সর্বোচ্চ হয় ( $25^{\circ}$ ) তখন শীতের তীব্রতা ও গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা সর্বোচ্চ মাত্রা ধারণ করে। আবার যখন কৌণিক অবস্থান সর্বনিম্ন হয় ( $22^{\circ}$ ) তখন শীতে ও গ্রীষ্মে তাপমাত্রার তীব্রতা সর্বনিম্ন মাত্রায় থাকে।

পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথটি প্রায়  $1,10,000$  বছরের ব্যবধানে বৃত্তাকার থেকে উপবৃত্তাকার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফলে বিপরীত দুটি খাতুতে (গ্রীষ্ম ও শীতে) পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে যথাক্রমে সবচাইতে কম ও সবচাইতে বেশি হয়। তাই পৃথিবীতে সূর্যকিরণের মাত্রা পরিবর্তিত হয় সবচাইতে বেশি। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনে সৌরদীনির্তির হাস-বৃক্ষি হয়, যা প্রতি  $80$  বছর ও  $11$  বছর অন্তর পরিবর্তিত হয়ে থাকে; তবে এসব পরিবর্তনের গতি শুধু শুধু নয়, এর মাত্রাও খুবই কম।

পৃথিবী সূর্যকিরণ শোষণ করে। অতঃপর এই শোষিত সূর্যকিরণ আবার শূন্যে বিকিরিত হয়। এই শোষণ ও বিকিরণ প্রক্রিয়ায় যে কোন রকম বাধা জলবায়ুর পরিবর্তনে সহায়তা করতে পারে। ট্রিনহাউস গ্যাস, অর্থাৎ যেসব গ্যাসের তাপধারণ ক্ষমতা বেশি, যেমন-জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ওজন,



যিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস পৃথিবীগৃষ্ঠে বা বায়ুমণ্ডলে তাপের বিকিরণ ধরে রাখে, তাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উষ্ণ থাকে। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। বায়ুমণ্ডলে ছিনহাউস গ্যাসের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর উষ্ণতার তারতম্য ঘটে।

আবার উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে নানা ঘটনার জন্যে পৃথিবীগৃষ্ঠ শীতল হয়। আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপণের ফলে সালফারযুক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়ে অতিক্রম কণার আচরণ করতে পারে যা পৃথিবীগৃষ্ঠ শীতল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া প্রতিফলিত সূর্যকিরণের প্রতি ১১ বছর অন্তর প্রায় ০.১ শতাংশ তারতম্য ঘটে। আরো দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও এই তাপ বিকিরণের হেরফের হয়ে থাকে। সূর্যের অবস্থানসাপেক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্যেও পৃথিবীগৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্নভাবে উষ্ণ হয়।

মোট কথা, সূর্যকিরণ পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রবেশ করে তার প্রতিফলিত ও শোষিত অংশ একটি সমতা বজায় রাখে। এই সমতায় গভীর সমন্বের তাপ ধারণ ক্ষমতা ও পৃথিবীপৃষ্ঠে বরফের আচ্ছাদনের একটি গতিশীল সম্ভব্য থাকে। তাপ শোষণ ও বিকিরণের সমতায় যেকোন ধরনের পরিবর্তন জলমণ্ডল এবং বায়ু সঞ্চালন ও সমুদ্র স্নোতের তারতম্য ঘটায়, ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নিয়মে জলবায়ু পরিবর্তিত হওয়ার গতি খুবই শুরু। তবে এ পরিবর্তন অবশ্যজ্ঞাবী এবং অনিবার্য।

### পাঠ ৪.৩ : জলবায়ু পরিবর্তনে মনুষ্যসৃষ্টি কারণসমূহ।

মানুষ-প্রভাবিত জলবায়ুর পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে জলবায়ুর প্রাকৃতিক পরিবর্তনসমূহকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। জলবায়ু যে বেশ দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তবে মানুষ কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে সে বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। মানুষ-প্রভাবিত জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বায়ুমণ্ডলে ইনহাউস গ্যাস বৃদ্ধি এবং সূর্যকিরণের বিকিরণ। এ দুটি বিষয়ই পৃথিবীর তাপ বিকিরণের পরিমাণকে প্রভাবিত করে এবং জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়।

অপরদিকে জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহার ও গাছ-গাছড়া পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে নির্গত অতিক্রম কণা সূর্যকিরণ পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌছাতে না দিয়ে বিকিরণ ঘটায়। তাতে পৃথিবীপৃষ্ঠ শীতল হতে পারে। এসব অতিক্রম কণা মেঘের পরিমাপেও হেরফের ঘটাতে পারে এবং মেঘও যেহেতু তাপ বিকিরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে তাই মেঘের কারণে সূর্যকিরণ বাধাপ্রস্তু হতে পারে।

১৭৫০ সালের শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী ইনহাউস গ্যাসের একটা আপেক্ষিক সাম্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ইনহাউস গ্যাস বৃদ্ধি পেতে থাকে যার সাথে মানুষ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ইনহাউস গ্যাস বা যৌগের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ভর করে যৌগের তাপ বিকিরণ ধর্ম, বায়ুমণ্ডলে তার বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের উপর।

এখানে কয়েকটি ইনহাউস গ্যাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো :

#### বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি :

১৭৫০ সালে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছিল ২৮০ পিপিএম, ১৯৯৯ সালে যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৭ পিপিএম হয়েছে, অর্থাৎ আড়াইশত বছরে প্রায় শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ জ্বালানি হিসেবে জীবাশ্ম-জ্বালানি ব্যবহার ও বনাঞ্চল ধ্বংস করা। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ০.৮ শতাংশ হারে কার্বন-



ডাই-অক্সাইড বৃক্ষি পেয়েছে। এ গ্যাসটির ঘনত্বও ব্যাপকভাবে বৃক্ষি পেয়েছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড মানুষ-প্রভাবিত বা মনুষ্যসৃষ্টি একটি প্রধান ছিনহাউস গ্যাস।

### বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাস বৃক্ষি :

বায়ুমণ্ডলে গত আড়াইশ বছরে, অর্ধাং ১৭৫০ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত শতকরা ১৫০ ভাগ মিথেন বৃক্ষি পেয়েছে। এই মিথেনের অর্ধেকের কিছু বেশি মনুষ্যসৃষ্টি-যা কৃষিকাজ, পশুপালন, প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ও ভূমি ভরাটের মাধ্যমে সৃষ্টি। ১৯৮৩ সালে বায়ুমণ্ডলে মিথেন ছিল ১,৭৪৫ পিপিবি, ১৯৮৮ সালে বৃক্ষি পেয়ে যা হয়েছে ১,৮১০ পিপিবি। তবে বাংসরিক বৃক্ষির হার বর্তমানে কমেছে, যা ১৯৯২ সালে প্রায় শুন্যের কোটায় এবং ১৯৮৮ সালে প্রায় ১৩ পিপিবি ছিল।



### বায়ুমণ্ডলে নাইট্রাস অক্সাইড বৃক্ষি :

প্রাক শিল্পিয়ন থেকে এখন পর্যন্ত নাইট্রাস অক্সাইড প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ বৃক্ষি পেয়েছে এবং বায়ুমণ্ডলে বর্তমানে এর পরিমাণ ৪৬ পিপিবি। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে নাইট্রাস অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রতি বছর বেড়েছে প্রায় শতকরা ০.২৫ ভাগ হারে। নাইট্রাস অক্সাইড একটি ছিনহাউস গ্যাস, যদিও এই গ্যাস প্রধানত বজ্রপাতের ফলে উৎপাদিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্টি এ গ্যাসের পরিমাণও কোন অংশে কম নয়। প্রধানত জুলানি হিসেবে জৈব পদার্থের ব্যবহার, কলকারখনার ধোঁয়া নির্গমন, পশু-পালন ব্যবস্থাপনা, কৃষিকাজ এবং জমিতে



নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহারের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে এর প্রসার ঘটে।

### বায়ুমণ্ডলে হ্যালোজেন কার্বন যৌগ এবং সম্পর্কিত অন্যান্য যৌগের বৃদ্ধি :

বায়ুমণ্ডলে হ্যালোজেনযুক্ত কার্বন যৌগ, যেমন, বিভিন্ন ধরনের সিএফসি (ক্লোরোফ্লোরোকার্বন), বৃদ্ধির জন্যে মানুষই দায়ী। তবে বর্তমানে এসব যৌগের কয়েকটির ঘনত্ব বায়ুমণ্ডলে যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি কয়েকটি যৌগের ঘনত্ব (যেমন সিএফসি-১২) বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনটিল প্রটোকলের মাধ্যমে এদের নির্গমন কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এসব গ্যাসের বিকল্প গ্যাসসমূহ, যেমন হাইড্রোক্লোরোফ্লোরোকার্বন এবং হাইড্রোক্লোরোকার্বন, বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলোও প্রিনহাউস গ্যাস। পারফ্রোরোকার্বন ও সালফার হেক্সাফ্রোরাইড মনুষ্যস্ত এবং বায়ুমণ্ডলে এগুলো দীর্ঘস্থায়ীভাবে

যানবাহনের কালো ধোঁয়া



অবস্থান করে। এগুলোর তাপ শোষণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। যদিও এসব গ্যাসের নির্গমন খুবই সামান্য। জলবায়ুর পরিবর্তনে এগুলোর ভূমিকা সুদূরপ্রসারী।

এছাড়াও ওজন, নাইট্রোজেনের অন্যান্য অক্সাইড যৌগসমূহ, কার্বন মনোঅক্সাইড ও উদ্ধৃয়ী জৈব যৌগসমূহ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে কাজ করে এবং এদের মধ্যে নাইট্রোজেনের অক্সাইড যৌগসমূহ এবং কার্বন মনোঅক্সাইড প্রধানত মনুষ্যসৃষ্টি।

বায়ুতে ভাসমান অতিক্রূদ্ধ পদার্থ দু'ভাবে সূর্য বিকিরণে ব্যাপাত ঘটাতে তথা জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থাৎ এসব অতিক্রূদ্ধ কণা প্রত্যক্ষভাবে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান থেকে সূর্যকিরণ বা তাপকে শোষণ করতে পারে অথবা পরোক্ষভাবে এরা মেঘের আনুবীক্ষণিক ভৌত গুণাবলি এবং মেঘের বিকিরণ ক্ষমতা ও পরিমাণে হেরফের ঘটাতে পারে। মনুষ্যসৃষ্টি অতিক্রূদ্ধ এসব ভাসমান কণা জ্বালানি হিসেবে জীবাশ্চ জ্বালানির ব্যবহার ও গাছপালা দহনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। তবে বায়ুমণ্ডলে এদের স্থায়িত্ব খুবই স্থল সময়ের জন্য।

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য মনুষ্যসৃষ্টি কারণসমূহের মধ্যে বন নিধনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। বন সংরক্ষণ, বিশেষ করে, উচ্চ অক্ষাংশে অঞ্চলসমূহের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ অক্ষাংশে বনাঞ্চলের পরিমাণ কমে গেলে বরফপৃষ্ঠ থেকে আলোর প্রতিফলন বেড়ে যায়। তাতে পৃথিবীগৃষ্ঠে সূর্যকিরণের শোষণ-বিশোষণে হেরফের হয়। ফলে এগুলি জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে।

তাই দেখা যায় যে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ জলবায়ুর উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং এর প্রতিক্রিয়া হয় ব্যাপক। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফলে বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও অন্যান্য প্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ উন্নতোভাবে বাঢ়ে। যার ফলে বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতার প্রভাব প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে।

### পাদটীকা :

জীবাশ্চ = প্রাণী উদ্ভিদের সামগ্রিক বা অংশবিশেষ যা সময়ের বিবর্তনের মাধ্যমে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থায় (কঠিন, তরল ও বায়ুবীয়) রূপস্থিতি হয় এবং ভূগৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।

অক্ষকোণ = বিশুব রেখা থেকে সমদ্বিভাগী উন্নত ও দক্ষিণের কঞ্চিত কোণকে বুঝায়।

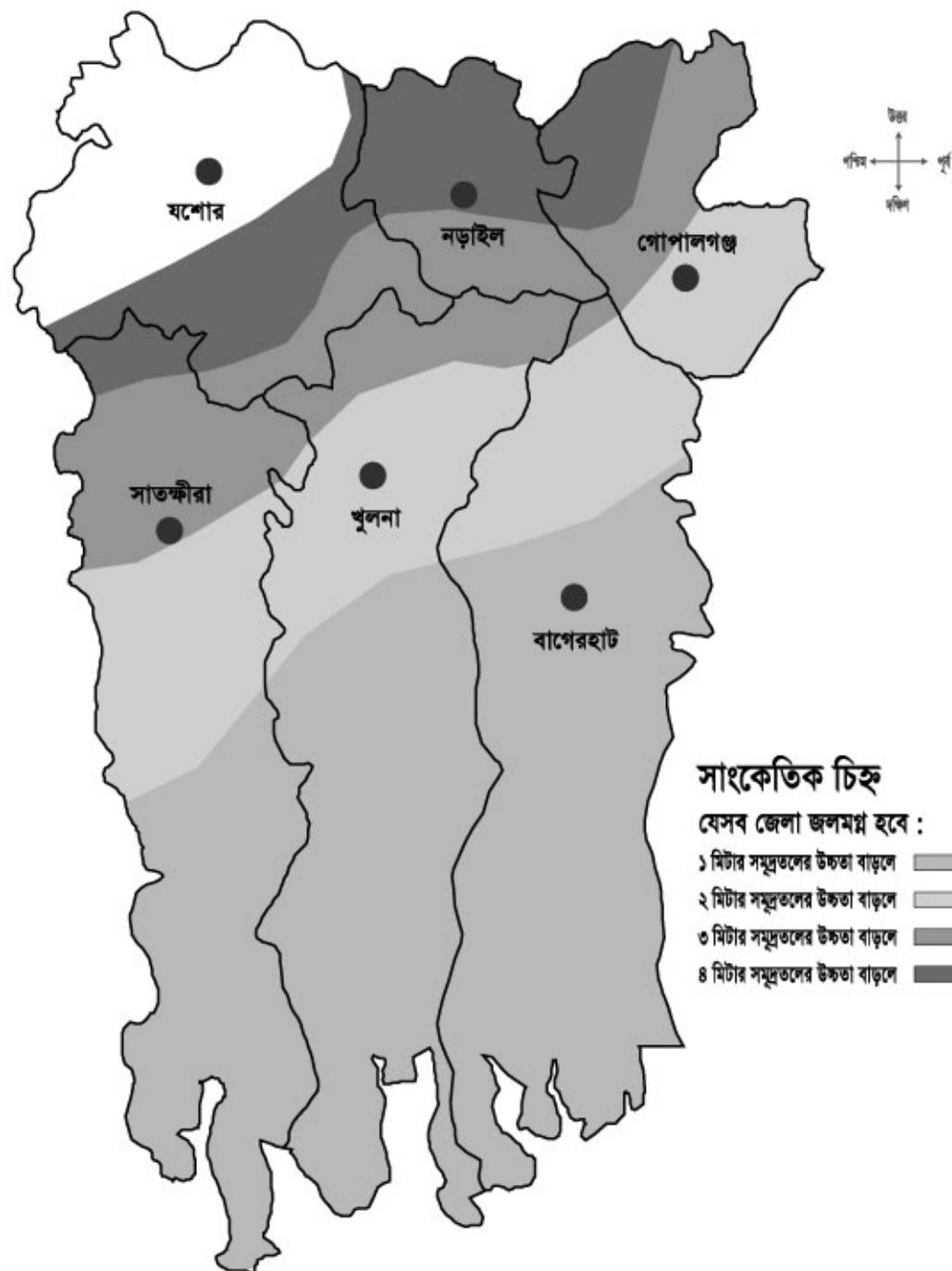
প্রিনহাউস = শীতপ্রধান দেশে সব্জি চাষের জন্যে কাঁচ দিয়ে ঘেরা এক ধরনের ঘর তৈরী করা হয়, যার ভেতরের উষ্ণতা বাইরের বরফ আচ্ছাদনজনিত ঠাণ্ডা থেকে গাছকে রক্ষা করে।

পিপিএম = পালস পার মিলিয়ন।

পিপিবি = পালস পার বিলিয়ন।

পূর্ণতরণ = পুনরায় ভরাট করা।

## জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে সমৃদ্ধপৃষ্ঠের উচ্চতা বাঢ়তে পারে



## অধ্যায়-৫

### বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া

এ অধ্যায়টিতে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ ও বাংলাদেশের কৃষি, পানি ও সম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে অবগত হতে পারবো।

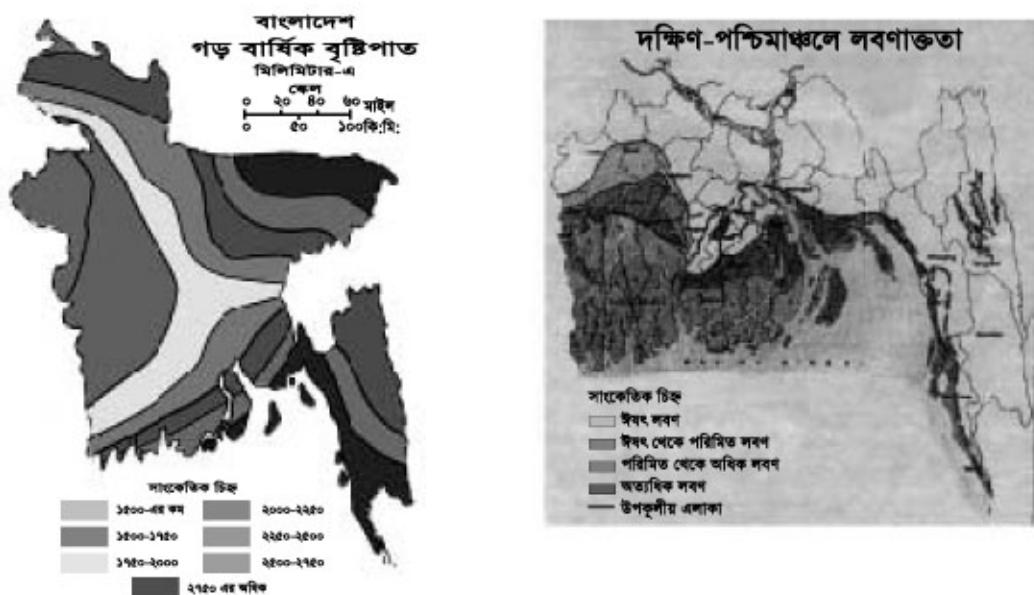
- ক) জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ,
- খ) বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও কৃষিতে এই পরিবর্তনের প্রভাব।

#### পাঠ ৫.১ জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, সমুদ্রপৃষ্ঠে উচ্চতা, বায়ুমণ্ডল ও মহাসাগরীয় স্ন্মোত্ত সম্বরালন এবং জলবায়ুর আকস্মিক তারতম্য পর্যালোচনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর অনেকগুলো পর্যবেক্ষণই প্রত্যক্ষভাবে মাপা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে এখন পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা  $0.6^{\circ}$  থেকে  $0.2^{\circ}$  সে. বৃদ্ধি পেয়েছে। গত শতাব্দীর নবাই-এর দশক ছিল সবচেয়ে উষ্ণ দশক। ১৮৬১ সাল থেকে তাপমাত্রা

বেকর্ড সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে ১৯৯৮ সাল ছিলো সবচাইতে উষ্ণ বছর। এ উষ্ণায়নের আঘাতিক বিস্তৃতি ও গত একশ বছরে পরিবর্তিত হয়েছে। সম্প্রতি (১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯ সাল) উষ্ণায়ন পৃথিবী জুড়ে প্রায় একই পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু সবচাইতে বেশি উষ্ণায়ন সংঘটিত হয়েছে উভর গোলার্দের মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ১৯৫০ এর দশক থেকে মহাসাগরীয় তাপের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই উষ্ণায়ন বেশি হয়েছে সমুদ্রের ৩০০ মিটারের মধ্যে। তাছাড়া ১৯৫০ থেকে ১৯৯৩-এর মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠাত সর্বনিম্ন তাপমাত্রারও বৃদ্ধি ঘটেছে।



প্রায় একাধিক ছাড়া উভর গোলার্দের মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশে বার্ষিক মহাদেশীয় বৃষ্টিপাত বেড়েছে প্রতি দশকে প্রায় ০.৫ থেকে ১ শতাংশ। অপরদিকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে ( $10^{\circ}$  থেকে  $30^{\circ}$  উ.) মহাদেশীয় বৃষ্টিপাত কমেছে প্রতি দশকে প্রায় ০.৩ শতাংশ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলো থেকে সম্প্রতি গ্রীষ্মমণ্ডলে বৃষ্টিপাত প্রায় ০.৩ শতাংশ বেড়েছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মহাসমুদ্র অঞ্চলেও বৃষ্টিপাত বেড়েছে। এই বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির সাথে নদীপ্রবাহেরও বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এসময়ে বায়ুমণ্ডলের উভর গোলার্দে জলীয় বাষ্প কয়েক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে প্রায় ১০ শতাংশ জলীয় বাষ্প বৃদ্ধি পেয়েছে। মহাদেশীয় উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে বরফ আচ্ছাদন ও মহাদেশীয় বরফের বিস্তৃতি ও হ্রাসের সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৬০ সালের পর থেকে বরফ আচ্ছাদন প্রায় ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এদিকে উভর গোলার্দের মহাসাগরীয় বরফ বিস্তৃতি ও হ্রাস পেয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে আন্টার্কটিক বরফ বিস্তৃতির বিষয়ে তেমন পর্যবেক্ষণমূলক নিয়ামক নেই। আন্টার্কটিক অঞ্চলে ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে গ্রীষ্মকালে বরফের পুরুত্ব প্রায় ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। জলবায়ু ও জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কিত

কারণসমূহ এদের মধ্যে অন্যতম। মহাসাগরীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সাগরের পানির সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রের পানির পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির ফলেও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য ঘটাতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে মহাদেশে অবস্থিত বরফ আঙ্গুদন উচ্চ তাপমাত্রায় গলে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া ভূগর্ভস্থ পানির অতি আহরণ, মহাদেশীয় অঞ্চলে বৃহদাকার জলাধার নির্মাণ, ভূপৃষ্ঠে পানির প্রবাহে বাধা সৃষ্টি এবং জলসেচ ও জলধার থেকে গভীরতের শিলাস্তরে পানির প্রবাহ-বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় তারতম্য ঘটাতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক থেকে দুই মিলিমিটার প্রতি বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে (গড়গড়তা ১.৫ মিমি প্রতি বছর)। ১৯৭০-এর পর পৃথিবীব্যাপী বায়ু সংঘালন ও সামুদ্রিক স্রোত সংঘালনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

### শুক মৌসুমে খরাপ্রবণ অঞ্চল



পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে দেখা গেছে যে বছরের উষ্ণকাল বেশি সময় ধরে স্থায়ী ও তীব্র হচ্ছে।

কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কিংবা বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া অথবা বৃষ্টিপাত একেবারেই না হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে যদিও বৃষ্টিপাতের সামগ্রিক পরিমাণে তেমন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি কিন্তু অন্ত সময়ের নিরিখে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের এই সম্পর্কসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে সামগ্রিকভাবে পৃথিবী উষ্ণ হয়ে উঠছে।

## পাঠ ৫.২ : বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনে সম্ভাব্য প্রভাব।

বিভিন্ন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব খুবই তীব্র হতে পারে। সাধারণভাবে সমগ্র দেশের উচ্চতা  $1.3^{\circ}$  সে. থেকে  $26^{\circ}$  সে. পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। যার ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং বর্ষায় ও শীতে এর পরিমাণ বর্তমানের চেয়ে ভিন্ন হবে। বর্ষায় বৃষ্টিপাত আরো বেড়ে যাবে এবং শীতে বৃষ্টিপাতশূন্য দিনগুলোর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। বর্ষায় অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে পানি প্রবাহের পরিমাণ বেশি হবে। ফলে দেশের অনেক এলাকায় বন্যার প্রকোপ তীব্র হবে। অপরদিকে শীতকালে উষ্ণ বায়ুমণ্ডল ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে প্রবেশে বন্যার প্রস্তুতি বাস্পীভবন বৃদ্ধি পাবে। তাতে বাতাসে, বিশেষ করে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে, জলীয়বাস্পের ঘাটতি দেখা দেবে। শীতে উজানে পানি প্রবাহহাস পাওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ পানির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে।

### জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভিত লক্ষণসমূহ :

নদীগুলোর সংকোচন (নদীতে লস্থালিষ্ট বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে), পলল অবক্ষেপণের ফলে নদীতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্যে জোয়ারের উজানমুখী ধারা সব মিলিয়ে, এদেশে বন্যার পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রতি একটি পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বৃষ্টিপাত ১০ শতাংশ বেড়ে গেলে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ ভূমি বন্যা উপস্থৃত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা। ভূমিক্ষয়, মাটির জৈব উপাদান বিনষ্ট, জলীয়বাস্পের ঘাটতি, মরুকরণ ও লবণ পানির অনুপ্রবেশ সব মিলিয়ে খাদ্যশস্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে বোরো ধানের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দ্বীপগুলো (উপকূলীয় নিহানগুলসমূহ, বিশেষত যেখানে বাঁধের নিরাপত্তা নেই) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে তলিয়ে যেতে পারে এবং উপকূলীয় অরক্ষিত অঞ্চলসমূহ ঘূর্ণিবড় ও জলোচ্ছাসের ফলে লবণাক্ত হয়ে যেতে পারে। শীতকালে বাতাসে জলীয়বাস্পের ঘাটতি এবং গ্রীষ্মকালে অতিবন্যার ফলে দেশের অরণ্য প্রতিবেশ বিনষ্ট হতে পারে। অপরদিকে শীতে হ্রাসকৃত নদী প্রবাহ ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের মূখ্য প্রভাবকগুলো পানি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত।

### পাদটীকা :

অক্ষাংশ = নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে অক্ষাংশ বলে।

বায়ু = বায়ু চলাচল।

সমুদ্রিক স্রোত সঞ্চালন = সমুদ্রের স্রোত চলাচল।

প্রবেশেন = পাতার মাধ্যমে গাছ বায়ুতে যে বাস্প নির্গত করে।

বাস্পীভবন = পানি বাস্পে পরিণত হওয়া।

পৌনঃপুনিকতা = বার বার সংঘটিত হওয়া।

## অধ্যায়-৬

### বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াসমূহ

এ অধ্যায়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সামগ্রিক অবস্থা  
কি হতে পারে সে সম্পর্কে জানবো :

- ক) সামগ্রিক প্রভাব,
- খ) কৃষিতে প্রভাব,
- গ) মৎস্য সম্পদে প্রভাব,
- ঘ) বনাঞ্চলে প্রভাব।

#### পাঠ ৬.১ : সামগ্রিক প্রভাব।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রধানত যেভাবে পরিলক্ষিত হবে তা হলো :

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে জলমগ্নতা ও জলাবদ্ধতা,
২. ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি,
৩. উপকূলীয় ভৌত প্রক্রিয়াসমূহের তীব্রতা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠের তিন থেকে চার মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে এসব এলাকার নিম্নাঞ্চল জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাও প্রায় স্থবির। তাই জলাবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। শীতকালে বৃষ্টিপাত কমে গিয়ে উজানে পানি প্রবাহ্ত্রাস পাওয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানি প্রবেশের হার বেশি হতে পারে। এসব প্রতিক্রিয়ার সাথে বাড় ও জলোচ্ছাসের ফলে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নানাভাবে বিস্থিত হবে। ভূমি, কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য সম্পদ এ অঞ্চলের মানুষের জীবিকার অন্যতম অবলম্বন। তাছাড়া এ অঞ্চলে প্রয়োজনের তুলনায় মিঠা পানির পরিমাণ খুবই কম। শীতে বৃষ্টিপাত হ্রাস পাওয়ার কারণে সেচের পানির প্রয়োজন হবে বেশি, ফলে ভূগর্ভস্থ পানির উপরও চাপ বাড়বে। জলবায়ুর পরিবর্তনে এ অঞ্চলের ভূমি সম্পদ ও পানির ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিপন্ন হবে।

### পাঠ ৬.২ : কৃষিতে প্রভাব।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অঞ্চলের কৃষি যে ভাবে প্রভাবিত হতে পারে :



- ক. বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি,
- খ. পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি,
- গ. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি,
- ঘ. বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির ফলে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি,
- ঙ. শীতকালে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় খরাপ্রবণতা বৃদ্ধি,
- চ. বাঢ় ও জলোচ্ছসের ফলে উপকূলীয় চরাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস, ইত্যাদি।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি কোন কোন ক্ষেত্রে ধানের ফলন যেমন হ্রাস করতে পারে তেমনি তা বৃদ্ধিও করতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে উদ্ভিদ তার খাদ্য প্রস্তুত করে। বাতাসের আর্দ্রতা যথাযথ হলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ২° সে. তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাতাসে যথাযথ আর্দ্রতা থাকলে ধানের ফলন কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তবে সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদের পাতার আয়তন বৃদ্ধি পায়, তবে তাতে ফসলের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। এখনও এ বিষয়ে অবশ্য কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি। তবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধির অনুমঙ্গ হিসেবে যে উষ্ণতা, বন্যা, খরা বা লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় তা পরোক্ষভাবে হলেও কৃষি ফলনে পরিবর্তন ঘটায়।

পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি উপকূলীয় এলাকায় বছরে প্রায় ০.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন শস্যের উৎপাদন হ্রাস করে। এর ফলে বোরো ধান ও গমের উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। তাই বলা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য লবণাক্ততা বৃদ্ধি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খাদ্যশস্য উৎপাদন সংকটাপন্ন করবে।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আউস ধানের উৎপাদন যেমন কমে যাবে তেমনি আমন ধানের উৎপাদনও বর্তমান অবস্থার তুলনায় প্রায় অর্ধেক কমে যাবে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ও বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বন্যা এবং জলমগ্নতার কারণেও ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যেতে পারে।

### ৬.৩ : মৎস্য সম্পদে প্রভাব।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় নদীর মোহনা মৎস্য সম্পদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এই এলাকার অসংখ্য বিল, হাওর এবং বাওড়ও গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মৎস্য খামারের জন্যেও এই এলাকা প্রসিদ্ধ।

ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ি ও গোপালগঞ্জের নিম্ন পলল ভূমির বিস্তীর্ণ এলাকায় অসংখ্য বিল রয়েছে; যেমন-চান্দা বিল, বড় বিল, মোল্লার বিল, টুঙ্গিপাড়ার বিল এবং বাঘিয়া বিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রয়েছে কুষ্টিয়ার চাঁপাইগাছি বিল, যশোরের গারলিয়া ও পানজিয়াপাটা বিল, নড়াইলের ছেনচুরি ও পোনামারা বিল, খুলনার বার্নাল, সলিমপুর, কোলা, কেটলা ও ডাকাতিয়া বিল এবং যশোহর, ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলায় অসংখ্য নদীর পরিত্যক্ত গতিপথ রয়েছে, যাকে বাওড় বলে। এসব বিল,

হাওর-বাগড় মাছের বিচরণক্ষেত্র। তাছাড়া উপকূল বরাবর জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত অঞ্চলও বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছের এবং চিংড়ির লালন ও নিরাপদ চারণ ক্ষেত্র হিসেবে খ্যাত।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মাছের সবচাইতে শুরুত্তপূর্ণ চারণক্ষেত্র হলো সুন্দরবন। অসংখ্য নদী, নালা ও খালে আবৃত এই সুন্দরবন দিনে অন্ততঃ দুইবার জোয়ারের পানিতে প্রভাবিত হয়। এই পানিতে ভাসমান পলল ও জৈব পদার্থ মাছের শুরুত্তপূর্ণ খাবার। তাই চিংড়িসহ কয়েক'শ প্রজাতির মাছের আবাসস্থল এ সুন্দরবন।

জলবায়ুর পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও লবণ আক্রান্ত এলাকার বিস্তৃতি ঘটাতে পারে। পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি মাছের প্রজননে প্রভাব সৃষ্টি করবে। উষ্ণতা বৃদ্ধি অনেক মাছের প্রজনন ক্ষমতা ত্বরান্বিত করতে পারে। ফলে অভিপ্রয়াণ চক্রে ভিন্নতা আসতে পারে। তাছাড়া নতুন লবণাক্ত পরিমণ্ডলে মাছের অভিযোগন বিস্তৃত হতে পারে। মৃদু লবণাক্ত পানির মাছের বেঁচে থাকা কষ্টকর হবে। তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ চিংড়ি উৎপাদনকারী মৎস্য খামার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড় ও জলোচ্ছাস বৃদ্ধির ফলেও উপকূলীয় মৎস্য চাষ বিস্তৃত হবে।

#### ৬.৪ বনাঞ্চলে প্রভাব।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান বনাঞ্চল সুন্দরবন প্রধানত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, ৪৫ সে. মি. বৃদ্ধি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার জন্যে সুন্দরবনের প্রায় ৭৫ শতাংশ সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া উচ্চ তাপমাত্রায় বাল্পীয়ভবন ও প্রদেশে বৃদ্ধি এবং শীতে পানির প্রবাহ ত্বাসের ফলে উচ্চ লবণাক্ততা মৃদু লবণ পানির গাছপালা ধ্রংস করতে পারে। পরিণামে ঘন বৃহদাকার গাছপালাসমূহ সুন্দরবন আগাছা ও ঝোপজঙ্গলে পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে সুন্দরবনের ঘন গাছপালার সমৃদ্ধি ব্যাহত হলে এখানে বসবাসরত প্রাণীকুলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

## অধ্যায় : ৭

### জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য খাপখাওয়ানো বা অভিযোজন প্রক্রিয়া

এ অধ্যায়ে আমরা পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজন বা খাপখাওয়ানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবো :

- ক) বাংলাদেশে খাপখাওয়ানো বা অভিযোজনের গুরুত্ব,
- খ) বাংলাদেশে খাপখাওয়ানো বা অভিযোজনের সমস্যা ও সম্ভাবনা,
- গ) সম্ভাব্য খাপখাওয়ানো বা অভিযোজন প্রক্রিয়াসমূহ।

#### পাঠ ৭.১ : বাংলাদেশে খাপখাওয়ানো বা অভিযোজনের গুরুত্ব ।

সম্প্রতি জল, স্তুল ও সামুদ্রিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রাণ তথ্য ও পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তন (যেমন তাপমাত্রা বৃদ্ধি) ইতোমধ্যেই বহুবিধ ভৌত ও প্রাণ সংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বন্যা ও মরুকরণের পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেও মানুষের জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান বা প্রতিবেশিক অবস্থানসমূহ (যেমন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, প্রবাল দ্বীপ ও গ্রীষ্মকালীন বনাঞ্চল ইত্যাদি) গুরুতরভাবে বিপন্ন হয়েছে।

অনেকক্ষেত্রেই বিপন্ন বাস্তুসংস্থান বা প্রতিবেশ এমনভাবে ধ্রংস হয় যে তা কোন অবস্থাতেই পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। মানুষের জীবন ধারণের জন্য, প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসসমূহ, জনবসতি, স্বাস্থ্য, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু সমাজ এবং প্রকৃতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদাশঙ্কা অর্থাৎ বন্যা, মরুকরণ, তাপমাত্রা ইত্যাদি, সমভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ। এসব চরম অবস্থা সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগত মাতৃত্বেতত্ত্ব রয়েছে-তারপরও এদের তীব্রতা ও পৌনঃপুনিকতা যে বৃক্ষি পাবে সে বিষয়ে সবাই একমত।

উপরে বর্ণিত প্রভাবসমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জলবায়ুর পরিবর্তিত অবস্থায় অভিযোজন বা খাপখাওয়ানো প্রক্রিয়া একটি জরুরি বিষয়। এ প্রক্রিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিপন্নতাকে কাটিয়ে উঠতে এবং এই পরিবর্তনের কোন কোন সুফলকে জীবন নির্বাহে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করতেও সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্যে জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রাহ্রাস করার ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না বলে ধরে নেওয়া যায়। তাই খাপখাওয়ানো প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে টিকে থাকায় সাফল্য আনতে পারে।

#### পাঠ ৭.২ : বাংলাদেশে খাপখাওয়ানো বা অভিযোজনের সমস্যা ও সম্ভাবনা।

বাংলাদেশে জলবায়ুর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপখাওয়ানো বা অভিযোজনের প্রধান সমস্যা হচ্ছে এখানে পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনায় পূর্ব প্রস্তুতির চেয়ে তাৎক্ষণিক তৎপরতাকে গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি। কিন্তু যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব প্রস্তুতিমূলক অভিযোজনে বাংলাদেশে প্রধান সমস্যাগুলো এরকম হতে পারে :

১. দীর্ঘমেয়াদী ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা কাঠামো না থাকা,
২. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় না থাকা (অবশ্য সম্প্রতি জাতীয় পানি-বীতি, উপকূলীয় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা [আইসিজেডএম] এবং সমন্বিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো হাতে নেওয়া হয়েছে যা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে),
৩. অভিযোজনের জন্যে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের সমন্বয় না থাকা,
৪. প্রচলিত পরিকল্পনা পদ্ধতি যথাযথ না হওয়া,
৫. পরিকল্পনা প্রণয়নে জনসাধারণের অংশগ্রহণ না থাকা, এবং
৬. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান পূর্ণাঙ্গ না হওয়া।

উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলোর বিপরীতে অভিযোজনের সম্ভাব্য দিকও রয়েছে। মানব সমাজ ও প্রকৃতি অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেকোন পরিবর্তনে অভিযোজন ঘটায় বা খাপখাইয়ে নেয়। অনেক সময় পরিকল্পনা মোতাবেক অভিযোজন করাও সম্ভব। এতে আগে ভাগে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে মানুষের অভিযোজন ক্ষমতা প্রকৃতি থেকে বেশি। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে স্বয়ংক্রিয় অভিযোজনের আলোকে পরিকল্পিত অভিযোজন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।

### পাঠ ৭.৩ : সম্ভাব্য খাপখাওয়ানো বা অভিযোজন প্রক্রিয়াসমূহ।

মানুষের জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতার দিকগুলো নিয়ে যখনই আলোচনা হয়েছে, বাংলাদেশের বিষয়ে যথেষ্ট আশঙ্কা ও উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ কোন প্রকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণ ছাড়াই বাংলাদেশ বিপদাপন্ন। এটা অনেকগুলো বিষয়ের জন্য হয়েছে, যেমন-বাংলাদেশের প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান, জ্ঞাকীর্ণ আবাসভূমি, অনিয়ন্ত্রিত দরিদ্রতা,



প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, ধীরগতিসম্পন্ন আর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইত্যাদি। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে অনেক বেশি এবং প্রকট হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া খুবই প্রবল হবে এবং এ অঞ্চলের দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কারণ এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করেই জনবসতি গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রধানত পানি সম্পদ ও কৃষি বিপদাপন্ন হবে। এই বিপন্নতায় অভিযোজন মূলতঃ দু'ভাবে হতে পারে। স্বয়ংক্রিয় অভিযোজন অথবা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরিকল্পিত অভিযোজন। স্বয়ংক্রিয় অভিযোজন স্বাভাবিক দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের অংশ হিসেবে ঘটতে পারে। পরিবেশ, মানুষ বা অন্য প্রাণী টিকে থাকার ক্ষেত্রে এই স্বয়ংক্রিয় অভিযোজন মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে যুক্ত।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিকল্প কৃষি উৎপাদন, পেশা নির্বাচন ও গৃহনির্মাণ ইত্যাদি পরিকল্পিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে খাপখাওয়ানো কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্যানেল (আইপিসিসি) প্রায় ২২৮ প্রকারের পূর্বানুমান ভিত্তিক অভিযোজন পত্র চিহ্নিত করেছেন। এগুলোকে ছয়টি বড় ফ্রন্টে ভাগ করা যায় :

১. ক্ষতি মেনে নেওয়া,
২. ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ক্ষতিকর দিকগুলো ভাগ করে নেওয়া,
৩. আসন্ন ক্ষতির সম্ভাবনাগুলোকে সতর্কতামূলক পত্রায় নিবৃত্ত করা,

৪. প্রভাবসমূহ নিয়ন্ত্রণে রাখা,
৫. সম্পদের সূচনা ব্যবহার,
৬. পুনর্বাসন করা।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রাচীনতার সামর্থ ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে এই অভিযোজন প্রক্রিয়াগুলো যাচাই করতে হবে।

নিচে কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব এবং সম্ভাব্য অভিযোজন পদ্ধা উল্লেখ করা হলো।

#### **ক. ক্ষেত্র : মিঠাপানির প্রাপ্যতা**

প্রভাব : মিঠাপানির অনিয়মিত প্রাপ্যতা, খরাপ্রবণতা বৃদ্ধি, নোনাপানির অনুপ্রবেশ, মিঠাপানির মৎস্য উৎপাদন হ্রাস, অতিপ্রাপ্যতার জন্য বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি।



অভিযোজন : প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থায় সার্বিক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, মৃদু ও অতি লবণাক্ত পানির মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, শীত মৌসুমে পদ্মাসহ অন্যান্য নদীর প্রবাহ বাড়ানোর কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া, নদী প্রবাহে সাবলীলতার জন্য উপযুক্ত নদী ব্যবস্থাপনা, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, লবণ সহনশীল ধানের জাত নির্বাচন, কাঁকড়া চাষ, নোনারোধী গাছ লাগানো ও মেলে চাষ ইত্যাদি।



#### **খ. ক্ষেত্র : উপকূলীয় সম্পদ**

প্রভাব : লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলমগ্নতা ও জলাবদ্ধ এলাকা বৃদ্ধি।

অভিযোজন : জল-সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, উঠানে বা

বাঁধের উপর শাকসবজীর চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্পে মনোযোগ বৃদ্ধি, কেওড়া ও মেলে জাতীয় উচ্চিদের চাষ, ঘরে ঘরে ছোট আকারে বাণিজ্যিক কাজ শুরু, সমর্পিত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষ ইত্যাদি।

#### গ. ক্ষেত্র : প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রভাব : বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস বৃদ্ধি।

অভিযোগন : ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাস ও বন্যা থেকে খাদ্য ও সম্পদ রক্ষার জন্যে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বাড়-



বন্যা মোকাবিলা করতে পারে স্বল্প-ব্যয়ে এমন গৃহ নির্মাণ, গৃহপালিত পশুর জন্যে উচু পাটাতন নির্মাণ, আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নতি এবং দুর্যোগ-পূর্ব ও দুর্যোগ-কালীন প্রস্তুতি, স্থানান্তরযোগ্য চুলা নির্মাণ, উন্নততর খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় জ্ঞান আরও ভালভাবে কাজে লাগানো, জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, উন্নততর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রবর্তন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা



গভীর পানিতে চাষযোগ্য ধান

তৈরিতে উন্নত করা, উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

ষ. ক্ষেত্র : কৃষি



বাড়ির আশিনায় সবজি চাষ



জলাবদ্ধ জমিতে ধাপের উপর সবজি চাষ

প্রভাব : লবণাক্ততা বৃদ্ধি বা সেচের জন্য মিঠাপানির দুপ্পাপ্যতার ফলে উৎপাদনহ্রাস।

অভিযোগন : শস্যে বৈচিত্র্য আনা, লবণসহিষ্ণু শস্য উৎপাদন, জলাবদ্ধ জমিতে চাষযোগ্য ধানের জাত নির্বাচন। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার, জলাবদ্ধ এলাকায় ধাপের উপর চাষ (ভাসমান চাষ) পদ্ধতির প্রবর্তন, কৃষককে নতুন অবস্থায় অভিযোগনে সাহায্য করা, নতুন বাস্তবতা অভিযোগনে প্রশিক্ষণ দেওয়া। উল্লেখ্য, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গোপালগঞ্জ ও পিরোজপুর জেলায় দীর্ঘকাল থেকে ভাসমান চাষ



কেওড়া চাষ



মেলে চাষ

বা ধাপের উপর চাষ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, অন্যান্য জলাবদ্ধ এলাকায় এই পদ্ধতিতে চাষ করা যেতে পারে।

#### ঙ. ক্ষেত্র : বন

প্রভাব : বনসম্পদহাস, সংশ্লিষ্ট জীবসম্পদের হাস।

অভিযোগন : উপকূলীয় বনায়ন ত্বরান্বিত করা, লবণসহিত উদ্ভিদের বনায়ন, বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদের



খাচায় মাছ চাষ



কীটনাশক



কাসায়নিক সার

অনুগ্রহেশ নিরুৎসাহিত করা এবং সুন্দরবন সংরক্ষণসহ প্রতিবেশে সংবেদনশীল বনাঞ্চলের সুষ্ঠু ব্যবস্থপনা।

### চ. ক্ষেত্র : মৎস্য

প্রভাব : মিঠাপানির মৎস্যসম্পদ হ্রাস।

অভিযোজন : উজানে মিঠাপানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, নদী-খাল দখলমুক্ত করা, নদী-খালের পলি অপসারণ,



লবণসহিত মাছ চাষ বৃদ্ধি, মৎস্য খামার বৃদ্ধি, মাছের অতিআহরণ নিরুৎসাহিত করা, মাছের পোনা সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ শিকারের আওতামুক্ত রাখা, ধানের সাথে মাছ চাষ, রাসায়নিক সার-কীটনাশক ছাড়া চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন এবং পানিদূষণ রোধ।

### ছ. ক্ষেত্র : স্বাস্থ্য

প্রভাব : পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব।

অভিযোজন : পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সচেতনতা বৃদ্ধি, নালা-ডোবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জল নিষ্কাশন উন্নত করা এবং জনস্বাস্থ্য ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সচেষ্ট হওয়া।

### পাদটীকা :

অভিযোজন = খাপখাওয়ানো।

সহিত = সহনশীল হওয়া।

## অধ্যায়-৮

### জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধা

এ অধ্যায়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবো :

- ক) অভিযোগন ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ,
- খ) ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধা ।

#### পাঠ ৮.১ : অভিযোগন ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জসমূহ ।

জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ পায় । যেমন :

ক. পৃথিবীব্যাপী বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি

-এটা বিশ্বব্যাপী ঘটবে

খ. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে একই প্রাকৃতিক এলাকায় অবস্থিত দেশসমূহে একই ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে, যেমন হিমালয়ে বেশি পরিমাণ বরফ গলন ও বৃষ্টিপাতের জন্যে চীন, ভারত, নেপাল,

বাংলাদেশ, ভুটান, পাকিস্তান এসব দেশের ভূপৃষ্ঠের ও ভূগর্ভস্থ পানির মজুদে পরিবর্তন ঘটবে এবং দেশগুলোর পলল ভূমিতেও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে।

#### উপকূলীয় বনায়ন

অবকাঠামো নির্মাণ



লবণ সহনশীল  
ফসলের জাত নির্বাচন



সূন্দরবন  
রক্ষায়  
ব্যবস্থা গ্রহণ



### আমাদের কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থ

জোয়ার-ভাটার  
স্থানীয় প্রবাহ  
সৃষ্টি করা



বহুমুখী কৃষি  
ব্যবস্থার প্রবর্তন



আবহাওয়ার পূর্বাভাস  
প্রযুক্তির উন্নয়ন

#### উন্নত সাম্প্রদায় সেবা নিশ্চিতকরণ

গ. আবার একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূগঠনের ভিন্নতার জন্যে নানা পরিবর্তন প্রকাশ পায়।

ঘ. পরিবর্তিত পরিস্থিতির মূল শিকার হবে পরিবার এবং ব্যক্তি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাথমিক চাপ তাদেরকেই সহজ করতে হবে।

জলবায়ুর পরিবর্তনে পরিবর্তিত সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিভিন্ন স্তরে অভিযোগন প্রক্রিয়াকে সহজ করবে। এই বিভাজনের সাথে সম্পর্কিত চারটি স্তরকে এভাবে প্রকাশ করা যায় :

ক. বিশ্বমাত্রিক স্তর

খ. রাষ্ট্রমাত্রিক স্তর

গ. উপ-রাষ্ট্রমাত্রিক স্তর

ঘ. তৃণমূল স্তর

বিশ্বনেতৃত্ব হলেন বিশ্বমাত্রিক স্তরের প্রধান নির্বাহী। এরা জাতিসংঘভিত্তিক বিভিন্ন কনভেশন ও সভার সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপ দেন। রাষ্ট্রমাত্রিক স্তরে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী-বাংলাদেশ সরকার। জাতীয়ভিত্তিক অভিযোজনে নেতৃত্ব দেবে সরকার। সরকার প্রতিবেশসাপেক্ষ, জন-কেন্দ্রিক এবং প্রয়োজনীয় অভিযোজন পছন্দ নির্দেশ করবেন। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ উপ-রাষ্ট্রমাত্রিক অভিযোজনের সঙ্গাব্য পছন্দ কার্যকর করে। এক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরে মূলতঃ পরিবার ও ব্যক্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এরা বিপন্নতাকে চিহ্নিত করতে উপযুক্ত তথ্য প্রদান করে এবং অভিযোজনে কি কি বিষয় প্রাধান্য পাবে সে সম্পর্কেও তথ্য সরবরাহ করে।

বাংলাদেশে যথাযথ অভিযোজনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রা, জনবসতির ঘনত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তাত্ত্বিক অভিযোজনের অনেক পছাই কার্যকর করা কঠিন হবে।

খুব সতর্কভাবে এগোলে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে সঙ্গাব্য অভিযোজনের ফল পাওয়া যেতে পারে। তবে অভিযোজন কি ভাবে হবে বা মানুষকে অভিযোজনের কি কি সঙ্গাব্য পছন্দ সম্পর্কে অবহিত করা হবে, সে বিষয়ে আরো গবেষণা, আর্থিক আনুকূল্য ও যথাযথ পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে।

অভিযোজন অনেকগুলো প্রক্রিয়ার সম্মিলিত ফল। তাই অভিযোজন কি, কেন, কিভাবে করা যাবে ইত্যাদির উত্তরগুলো পাওয়া এবং অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সম্পদের উপযোগিতা নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও আর্থিক সংস্থান বিবেচনায় বাংলাদেশের মতো দেশের পক্ষে অভিযোজন একটি কঠিন বিষয় হবে। যেমন অভিযোজনের অনেক বিষয় আন্তর্জাতিক, দ্বিজাতিক বা বহুজাতিক আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে হতে পারে। তাই পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতার মাধ্যমে অভিযোজনের আন্তরাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো কার্যকর হতে পারে।

আবার দেশে ইতোমধ্যে গৃহীত অভিযোজন প্রক্রিয়াগুলোকে সন্নিবেশ করাও একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। ধরে নেয়া হয় যে, স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ এলাকা ভিত্তিক প্রয়োজনগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেবে, যাতে একটি টেকসই ভবিষ্যৎ তৈরী হতে পারে। সে কারণে তৃণমূল পর্যায়ে প্রক্রিয়াসমূহকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং এ স্তরের তথ্যগুলোকেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

#### পাঠ ৮.২ : ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি।

অভিযোজনের পূর্বশর্ত হলো একটি গতিশীল কার্যক্ষম সমাজ, সংক্ষারমুখী ও মিতব্যযী প্রশাসনিক অবকাঠামো। এগুলোর সাথে তৃণমূল পর্যায়ের তথ্য ও তথ্যায়নের সম্বয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ অভিযোজনের পদ্ধা নির্দেশ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে প্রায় সব আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড কোন না কোনভাবে জলবায়ু নির্ভর এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযোজিত হচ্ছে। এসব প্রকৃতিজাত শিক্ষাকে আমাদের পরিকল্পনায় গুরুত্ব সহকারে ধারণ করতে হবে।

ধরে নেওয়া হয় জলবায়ু পরিবর্তন একটি দূরবর্তী প্রক্রিয়া। হয়তো কয়েক দশকের প্রয়োজন হবে। কিন্তু এ রকম প্রক্রিয়ার সাথে আমাদের বিপদ্ধস্ত সমাজের পরিচয় আছে এবং এই সমাজ জলবায়ুগত ডিম্বতা ও অনিশ্চয়তার সাথে সংঘাত করে বেঁচে আছে। তাই অভিযোজিত হওয়া নতুন কিছু নয়। যেমন ১৯৯৮ সালের বন্যা। দেখা গেছে যে অনেক কৃষকই ঐ সময়ে তাদের শস্য ফলনের পূর্বের তালিকা পরিবর্তন করে রবিশঙ্গের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অনেকে আবার বিলম্বে ধানের চাঁচা রোপন করেছিল। তারা জানতো এতে ফলন ভালো হবে না, তবে তা খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভ্যন্ত। যদি তাদেরকে কেবল দুর্যোগের ধরন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা দেওয়া যায় (যেমন-বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি) তবে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ তাদের পরস্পরের জ্ঞানের আদান-প্রদানের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে পারবে। তবে এর জন্যে তথ্যের অবাধ আদান-প্রদান এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অপরিহার্য।

এই সতর্কীকরণ শুধু গ্রামবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না; বরং সমাজের ও দেশের বিভিন্ন স্তরে, যেমন-রাজনৈতিক কর্মী, পরিকল্পনাবিদ, জন-প্রশাসন, সুশীল সমাজ, পেশাদার গোষ্ঠী, গবেষক, এমনকি বিভিন্ন ব্যক্তি পর্যায়েও, জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক বিপন্নতা ও সংশ্লিষ্ট অভিযোজন পদ্ধা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

এক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতি সরকারের দায়িত্ব অনেক। তাই সরকারকেই সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে অভিযোজন প্রক্রিয়া পরিচিত করার দায়িত্ব নিতে হবে। যেমন, যেকোন দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কৃষি-বীমা চালু রাখা, স্থানীয় কর মশুকুফ এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবকাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।

গবেষণা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমেও অভিযোজনকে সাবলীল করা যেতে পারে। বাংলাদেশ এসব বিষয়ে বিশেষ নেতৃত্ব দিতে পারে, কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন-বিষয়ক পরিস্থিতি সম্পর্কে এ দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

## এ পুস্তিকা প্রগয়নে যেসব বই-পুস্তকের সহায়তা নেয়া হয়েছে :

আহমেদ, আর (১৯৯৭) আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞান / রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

Brammer, H. (1996) *The geography of the soils of Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka

চতুর্বর্তী, বি, রায় ; এ, বসু, মজুমদার এবং রায়, এস (২০০০) মানুষ ও পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বুক বোর্ড, কোলকাতা

Chapman, J.L. and Reiss, M.J. (1997) *Ecology : principles and applications*. Cambridge University Press

এ, চট্টপাধ্যায় পরিবেশ টিডি পাবলিকেশন, কোলকাতা, ভারত

Enger, E.D. and Smith, B.F. (1992) *Environmental Science : A Study of Interrelationship (Fourth Edition)*. Wm C Brown Publishers

Erda, L. , Bolhofer, W.C. , Huq, S. , Lenhart, S. , Mukherjee, S.K., Smith, J.B. and Wisniewski J (Eds) (1996) *Climate Change vulnerability and Adaptation in Asia and the Pacific*. Kluwer Academic Publishers

ওহ বাগচি ডি, এন ; সেন, এস ; ব্যানার্জী এস, কে প্রকৃতি ও পরিবেশ কোলকাতা বুক হাউস (প্রাই) লিঃ কোলকাতা

Huq, S., Karim, Z., Asaduzzaman, M. and Mahtab, F (Eds) (1999) *Vulnerability and Adaptation to Climate Change for Bangladesh*. Kluwer Academic Publishers, London

Houghton, J.T., Ding, Y., Griggs, D.J., Noguer, M., Van der Liden, P.J., Dai, X., Maskell, K. and Johnson, C.A. (2001) *Climate Change 2001 : the Scientific Basis (Contribution of Working group I to the third assessment report of the intergovernment panel on climate change)* Cambridge University Press

- IUCN-Bangladesh (2001) *The Bangladesh Sundarbans : a photoreal sojourn*. IUCN Bangladesh Country Office, Dhaka
- Khan, M.S., Huq, E., Huq, S., Rahman, A. A., Rashid, S.M.A. and Ahmed, H. (Eds) (1994) *Wetlands of Bangladesh*. Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS), Dhaka
- Khan, M.H. and Fitzcharles, K. (1998) *Environmental Management Field Handbook for Rural Road Improvement Projects*. CARE Bangladesh
- Kothari, A. (1997) *Understanding Biodiversity : Life Sustainability and equity*, Orient Longman
- McCarthy, J.J., Canziani, O.F., Leary, N.A., Dokken, D.J. and White, K.S. (Eds) (2001) *Climate Change 2001 : Impacts, Adaptation and Vulnerability* (Contribution of working group II to the third assessment report of the Intergovernmental panel on climate change). Cambridge University Press, Bangladesh.
- Odum, E.P. (1996) *Fundamentals of Ecology*. Natraj Publishers Dehra Dun, India
- Rashid, H.-er. (1991) *Geography of Bangladesh*. The University Press Limited, Dhaka
- Reimann, K.U. (1993) *Geology of Bangladesh*. Gebruder Borntraeger, Berlin
- Subramanian, V. (2002) *A Textbook In Environmental Science*. Narosa Publishing House, New Delhi
- Saha, S.K. and Schaerer, C. (2002) *Report on Community Vulnerability Assessment in southwest Bangladesh*. CARE-Bangladesh
- সুন্দরবন ট্যাডি গ্রুপ, তেল-গ্যাস : সুন্দরবনের ঐতিহ্য বনাম উন্নয়ন, জগাঞ্জির, খুলনা
- W'o Okot-Uma, R. and Odiachi, R.M.R. (Eds) (1999) *Biodiversity and Gender for Sustainable Development*. Commonwealth Secretariat and SFI Publishing
- World Bank (2000) *Bangladesh : Climate change and sustainable development*. Report No 21104-BD, Documents of the World Bank.

## কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বৃক্ষি কার্যক্রম পরিচিতি-

**কার্যক্রমের লক্ষ্য :** জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বাংলাদেশের মতিঃ-পণ্ডিতাঙ্গলের মাধ্যমিক কুল পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃক্ষি করা ও প্রাথমিক ধারণা প্রদান।

**কার্যক্রমের উদ্দেশ্য :** জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে মতিঃ-পণ্ডিতাঙ্গলের মাধ্যমিক কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণ ও পূর্ণাঙ্গ সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং মাধ্যমিক কুল পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে পাঠ সহযোগনের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের জন্য প্রস্তাবনা প্রদান।

**কর্ম এলাকা :** খুলনা জেলার মাকোপ, ঘৰ্যাশোর জেলার কেশবপুর, নড়াইল জেলার কালিয়া, বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ ও শরণবোগুল উপজেলার মোট ৬৫টি মাধ্যমিক পর্যায়ের কুল।

**যাত্রের জন্য :** একাউন্সেড (AOSED) নির্বাচিত ১৫টি ও ভাক দিয়া যাই (DDJ) নির্বাচিত ৫০টি মাধ্যমিক পর্যায়ের কুলের ১৫,৫০০ ছাত্র-ছাত্রী, ৮০জন শিক্ষক, কুলসমূহের পরিচালনা কমিটি ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষক সেতৃণ্ড।

**কর্ম পদ্ধতি :** শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল, ছাত্র-ছাত্রীদের সহজ পাঠ্য পুস্তিকা (৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণী ও ৮ম-৯ম শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি সহজ পাঠ্য পুস্তিকা), চিপ চার্ট এবং শিক্ষক সহায়িকা (শিক্ষা উপকরণসমূহ) একাউন্সেড (AOSED) প্রদান করে।

**শিক্ষক প্রশিক্ষণ :** একাউন্সেড (AOSED)-এর কর্মএলাকায় ১৫টি ও ভাক দিয়া যাই (DDJ)-এর কর্মএলাকায় ৫০টি কুলের ৮০জন শিক্ষককে ২ দিন ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ ও আকর্ষণের মোড়কালীন সময় প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের খনা পর্যায় ১টি রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

**কুল পর্যায়ে কার্যক্রম :** নির্বাচিত কুলসমূহের ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি জাতে শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ৮টি সেশনে পাঠদান ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।



**Implemented by AOSED  
In Partnership with CARE Bangladesh RVCC Project  
Financed by Canadian International Development Agency (CIDA)**